পরিস্থিতি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্যানিক

আপিসের বাড়িটি পশ্চিমমুখী। বাহিরে আসিয়াই ধনেশের চোখে পড়িল, আকাশটা আশ্চর্যরকম লাল। আকাশের খানিকটা পড়িয়াছে রাস্তার অপর দিকের বাড়ির আড়ালে। অন্তরালের ওই দিগন্তে নিশ্চয় স্তরে স্তরে সাজানো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মেঘ আছে। মেঘের প্রতিফলন ছাড়া আলোর ছটা এত রক্তিম হয় না।

হকারের চিৎকারে বুকটা ধ্ড়াস করিয়া উঠিল। এত জোরে চিৎকার করে কেন ? খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মতো এমনই টনটন করিতেছে, ফিসফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝনঝন করিয়া উঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোনো প্রয়োজন নাই। দুটি পয়সা বাহির করিয়া ধনেশ একটা কাগজ কিনিল। অনেকেই কিনিতেছে। রবিবার তার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসিয়া একবার চোখ বুলানো ছাড়া খবরের কাগজের সঙ্গে জগদীশ কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখিত না, সেও আজকাল সকালে বিকালে কাগজ কেনে। একটু বেলা করিয়া তার বাড়িতে গেলেই বিনা পয়সায় কাগজ পড়িতে পাইবে জানে, কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না।

স্পষ্টই বলে, না ভাই, অত পয়সার মায়া করলে আর চলে না। যে সময় পড়েছে, একঘণ্টা আগে জানা পরে জানার ওপরেই হয়তো বাঁচন-মরণ।

এমন করিয়া বলে যে সর্বাঙ্গ যেন শিরশির করিয়া উঠে। মনে হয়, অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘণ্টা সময়ের ওপারেই যেন অনির্দিষ্ট ও অনন্যসাধারণ মরণ ভয়াবহ মূর্তিতে ওত পাতিয়া আছে, একটা অদ্ভুত অকথ্য সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া !

জগদীশ তবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে মামাবাড়ি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়িতে সে থাকে একা, নিজে রান্না করিয়া খায়। যেমন হোক একজন ভাড়াটে পাইলে বাড়িটা ভাড়া দিয়া কোনো সস্তা মেস বা বোর্ডিং এ চলিয়া যাইবে। তার ভয় ভাবনা শুধু নিজের জন্য। স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ধনেশের নাই। একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনিও আবার এমন জায়গায় থাকেন যেখানে নাকি ভয় আরও বেশি। এমন সঙ্গতিও তার নাই যে মফস্বলে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দেয়।

কৃপণ ও বিচক্ষণ জগদীশকে দেখিলে সাধে কি হিংসায় তার বুকটা জ্বলিতে থাকে। মনে হয়, এই লোকটাই বুঝি তার মন্দ অদৃষ্টের জন্য দায়ি।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় জগদীশের গোলগাল মুখে ছোটো ছোটো চোখ দুটি পিটপিট করিতেছিল, ধনেশকে দেখিতে পায় নাই। ধনেশ নাগাল ধরিয়া বলিল, নতুন খবর কিছু নেই।

জগদীশ বলিল, তা নেই, কিন্তু—

জগদীশের মুখখানি চিন্তিত, বিমর্ষ। মাসখানেক আগে বউ আর ছেলেমেয়েরা যখন কাছে ছিল, তখনও তার চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সক্রিয় উত্তেজনার ভাবও তার মধ্যে দেখা যাইত। এক মাসের মধ্যে মানুষটা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত পথিক যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে, কথা বলিতে শুরু করিয়া সেও আজকাল তেমনইভাবে থামিয়া যায়।

একটা ব্যাপার ভালো ঠেকছে না।—ঘাড়ে বসানো মাথাটা জগদীশ ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকে, এ আর পি-র একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেন বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপেনি। আজকালের মধ্যে একটা কিছু হবে বোধ হয়, নইলে হঠাৎ--

ধনেশের মুখ পাংশু হইয়া গেল।—এমনি হয়তো বন্ধ করেছে।

তাই কখনও করে ? একটা বিজ্ঞাপন চলছিল, কী দরকার ওদের সেটা বন্ধ করবার ? এ তো আর তোমার খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়, একটা মানে নিশ্চয় আছে। আমি ভাবছিলাম কি—

কথা বলিতে বলিতে দুজনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরও কয়েকজন কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎকর্ণ, উদগ্রীব হইয়া আছে। ঢোঁক গিলিতে গিয়া জগদীশ প্রথম বারের চেষ্টায় ঢোঁকটা গিলিতে পারিল না।

—আমি ভাবছিলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু হয়ে যাবে, এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপনটা বন্ধ করেছে। ভেবেছে, রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজর পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হত তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে। এইসব ভেবে—

অপরিচিত যারা কথা শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজন সায় দিয়া বলিল, সেটা সম্ভব। আবার এও হতে পারে যে, খবরটা ওরা চেপে দিতে চায়। বিজ্ঞাপনটা নেই দেখে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববে এখন দু-চারদিন কোনো ভয় নেই।

আর একজন বলিল, যা বলেছেন মশায় !

ট্রামে উঠিয়া বসিয়া জগদীশ বলিল, এমন ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই কী বলব। দোটানায় পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে পাঠালাম এক জায়গায় উনি গেলেন আর এক জায়গায়, বিপদের সময় কার কাছে ছুটব আমি ? এখানে গেলে ওখানকার ভাবনা, ওখানে গেলে এখানকার ভাবনা। —দাও, একটা বিড়ি দাও।

বিড়ি নেই।

বিড়ি ছিল। জগদীশকে দিবে না। ট্রামে এতলোকের সামনেই লোকটাকে তার মারিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সব সময় কেবল নিজের কথা ভাবে, নিজের কথা বলে। ভয়ভাবনা যেন তার একার, একচেটিয়া। ধনেশ যেন নিশ্চিন্ত মনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে, তার ভাবনা করিবারও কিছু নাই, বলিবারও কিছু নাই। এতকালের বন্ধু সে লোকটার, নিজে রাঁধিয়া ভালো খাইতে পায় না ভাবিয়া এক মাসের মধ্যে কতবার ওকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রতিদানে তাকে একদিন একটু মুখের সহানুভূতি জানানোর অবসরও ওর হয় না। যখন তখন শুধু শুনাইতে পারে, এবার পাঠিয়ে দাও হে, সকলকে এবার কোথাও পাঠিয়ে দাও, আর দেরি নয়।

জানাশোনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, জগদীশের মতো প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এতলোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা, অসহায় মনে হয়। কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না। শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দুপেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোশ সকলের খসিয়া গিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিতে পায়, পিছনদিকের লম্বা সিটে বসিয়া একজন কী যেন বলিতেছে, আশেপাশে কয়েকজন মন দিয়া শুনিতেছে। রাস্তায় জগদীশের কথা শুনিয়া এই লোকটিই খবরের কাগজে এ আর পি-র বিজ্ঞাপন না থাকার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিল। বেশ বুদ্ধিমানের মতো চেহারা লোকটির। ভিতরের খবরও হয়তো কিছু কিছু রাখে। কাছে গিয়া শুনিলে হইত না কী বলিতেছে ?

বাড়ির সামনে ছোটো রোয়াকে বসিয়া ছোটো ভাই রমেশ পাড়ার ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। তার হাতে ছিল সিগারেট, মুখে ছিল হাসি। ধনেশকে দেখিয়া হাসি মিলাইয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আড়াল করার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। ধনেশের সামনে কোনোদিন সে সিগারেট খায় না। ঔদ্ধত্য দেখাইতে চাহিয়াও অভ্যাসের বশেই বোধ হয় একটু তাকে ইতস্তত করিতে হইল, তারপর সিগারেটটা মুখে তুলিয়া টান দিল জোরে।

আজ তিন দিন রমেশের সঙ্গে তার কথা বন্ধ।

রমেশ বউকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতে আসিয়াছিল। শুনিবামাত্র ধনেশ যেন খেপিয়া গিয়াছিল একেবারে।

দাও, তাই পাঠিয়ে দাও। আজ পাঠিয়ে দাও—এই দণ্ডে। তুমিও থাকগে শ্বশুরবাড়ি—আমাদের সঙ্গে থেকে মরবে কেন !

চাকরি ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তাই বুঝি ভাবলেন আপনি ?

ভাবব না ? বউমাকে রাখতে গিয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে, অত বোকা বুঝিয়ো না আমায়।

না আপনি খুব বুদ্ধিমান। এত যদি বুদ্ধি আপনার, দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কেন ? আপনাকে কদিন বারণ করেছি। আপনি কথা শোনেন না, পাগলের মতো করতে থাকেন। আপনাকে ও রকম করতে দেখলে বাপ মা ভাইবোনের জন্য ছেলেমানুষের ভাবনা হবে না ?

লাবণ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ না করিলে হয়তো অন্ধ ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও ধনেশ আত্মসম্বরণ করিতে পারিত। রমেশকেও দোষ দেওয়া যায় না। এ বাড়ির অস্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে লাবণ্যের মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সকলের অবিরাম পরামর্শ ও আলোচনায় ভয়ংকর সব সম্ভাবনা যতই অনিবার্য ও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, বাপের বাড়ির সকলের জন্য সে তত উতলা হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কপাল কুটিয়া অনর্থ করিতে থাকে। সে সমস্ত সহ্য করিতে হয় রমেশকেই।

ছেলে মানুষ ! বয়স ভাঁড়িয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বাপ, ছেলেমানুষ ! পারুল ছেলেমানুষ নয় ? পারুল যদি এখানে থাকতে পারে, তোমার আহ্লাদি বউও থাকতে পারবে।

পারুল ধনেশের বড়ো মেয়ে। বছর সতেরো বয়স হইয়াছে, মানুষকে বলা হয় চোদ্দো।

পারুল আমাদের কাছে আছে।

বউমাও তাই আছেন।

তখন রমেশও আর ধৈর্য ধরিতে পারে নাই।

সেই জন্যই সরিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে না।

এ বাড়িতে মানুষ থাকে না, না ?—কী থাকে, জন্তু জানোয়ার ?

পাগল থাকে। আপনার মতো যাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেছে।

ঠিক পাগলের মতোই তখন দুপা সামনে আগাইয়া ধনেশ তার ত্রিশ বছর বয়সের ভাইয়ের গালে চড় বসাইয়া দিয়াছিল। ধনেশের নিজের বয়স পঞ্চাশের কাছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। মাঝখানে তিনটি বোন, তারপর এই ভাই। এত বড়ো উপযুক্ত ভাইকে চড় মারিয়া বসার ঝোঁক অবশ্য ওই একদিনের একটিমাত্র কলহে জাগে নাই। কিছুদিন হইতে মনটা বিগড়াইয়া যাইতেছিল।

মনে হইতেছিল, রমেশও বুঝি তার অবস্থা বুঝে না, তার কথা ভাবে না, অন্য সকলের মতোই সে স্বার্থপর। প্রথমে রমেশের নিশ্চিত নির্বিকার ভাব সে বুঝিতে পারিত না। যে খবর শুনিয়া তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, খবরটা মন দিয়া শুনিবার আগ্রহ পর্যন্ত রমেশের দেখা যাইত না। পরামর্শ

করিতে ডাকিলে কেমন উশখুশ করিতে থাকিত, বিরক্ত হইয়া বলিত, অত ভেবে লাভ কী ? আপিস যাইতেছে, আড্ডা দিতেছে, গান গাহিতেছে, বউ আর পারুলকে সঙ্গে করিয়া সিনেমায় যাইতেছে, কিছুই যেন হয় নাই, সর্বনাশ যেন ঘনাইয়া আসে নাই ঘরের দুয়ারে। বিস্ময়ের পর জাগিয়াছিল বিরক্তি ও ক্ষোভ আর সেই মনোভাব মনের মধ্যেই পাক খাইতে খাইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহের : ছেলে নাই, মেয়ে নাই, শুধু সে নিজে আর তার বউ, তাই কি রমেশ এমন নির্ভয় ও নিশ্চিত হইয়া আছে ?

তাই বটে। এ যুগের ভাই, বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছে এক স্কুলে পড়া ধিঙ্গি মেয়েকে, দিবারাত্রি সে মন্ত্র দিতেছে কানে কানে; তার কী দায় পড়িয়াছে দাদার ভাবনা ভাবিতে গিয়া মাথার টনক নড়িতে দিবার।

রমেশের প্রত্যেক কথা আর কাজে সে এই চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। তার সঙ্গে সে যে পরামর্শ করিতে চায় না তার কারণ তার দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার ইচ্ছা তার নাই, নিজে কী করিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে চায় বলিয়া তাকে সে তিন মাসের ছুটি লইয়া চেঞ্জে যাইতে বলে। পাটনায় একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে ? করিবে না, চাকরির ছলে এই তো তার সরিয়া যাওয়ার সময় ! খরচ কমাইয়া টাকা জমাইতেছে, তাকে বলে নাই, তার মানেও ধনেশ জানে। রমেশের গম্ভীর ও চিন্তিত হইয়া উঠিবার কারণ, তর্ক আর কথা কাটাকাটি আরম্ভ করার কারণ, শহরের হাজার হাজার লোক যে স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, সেইখানের বাপ-মা ভাইবোনের জন্য লাবণ্যকে উতলা হইতে পরামর্শ দিবার কারণ, সব ধনেশের কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

সুতরাং কারণে অকারণে খিটিমিটি বাধিতেছিল। কেউ কারও কথা সহ্য করিতে চায় না, পরস্পরের নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত সময় সময় দু জনের অসহ্য মনে হয়। মনের এই চিরন্তন প্যাঁচ, ঢিল দেওয়ার, আলগা করার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। তারপর পুলককে উপলক্ষ করিয়া দু জনের মধ্যে কয়েকবার রীতিমতো ঝগড়া হইয়া গেল।

মুখ অন্ধকার করিয়া রমেশ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, পুলককে ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে বলছেন ?

হ্যাঁ, কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুক। জবরদস্তি লড়াইয়ে পাঠাবার আইন পাশ হচ্ছে শুনলাম।

আইন পাশ হলে ওখানে ওকে ধরতে পারবে না ?

তুমি বোঝো ছাই। কলেজ থেকে নাম, ঠিকানা জেনে খুঁজতে আসবে, এখানে না থাকলে বলতে পারব, কোথায় গেছে জানি না। ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাও বলতে পারব। ধনেশের ভুরু কুঁচকাইয়া গেল, এ কথাটা তো আগে খেয়াল হয়নি ! কাগজে ওর নামে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আগে থেকে ছাপিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না ?

আপনি ওর মাথাটা খাচ্ছেন দাদা। কোথায় আপনি কী গুজব শুনে আসবেন আর আপনার এতবড়ো জোয়ান মর্দ ছেলে চোর-ডাকাতের মতো লুকিয়ে বেড়াবে ! এর চেয়ে লড়াইয়ে গিয়ে মরা ভালো। আইন যদি পাশ হয়, লড়াইয়ে না যেতে চায়, জেলেই নয় যাবে। তাও ঢের ভালো।

তুমি তো তা বলবেই।

একটা বিশ্রী কলহ হইয়া গেল। কাকার কাছে বকুনি আর উপদেশ শুনিয়া পুলক একবার ঠিক করিতে লাগিল ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাইবে না, আবার উমার কান্না ও ধনেশের ধমকধামক যুক্তিতর্কে মত বদলাইয়া ফেলিতে লাগিল। ধনেশ ও রমেশের মধ্যে আরও কয়েকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল, প্রচণ্ড এবং কুৎসিত। মনে হইল পুলকের ভালোমন্দের প্রশ্ন ভুলিয়া রমেশও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তার জিদ চাপিয়া গিয়াছে যে পুলককে কোথাও সে যাইতে দিবে না।

এমনই যখন চলিতেছিল, লাবণ্যকে বাপের বাড়ি পাঠানোর কথাটা রমেশ তাকে বলিতে গেল এবং সংক্ষিপ্ত অর্থহীন কলহের পর ধনেশ তার গালে বসাইয়া দিল চড়। কদিন পরে মাসকাবারে বেতন ও ছুটি পাইলে রমেশ নিশ্চয় লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে। নিজে বোর্ডিং অথবা মেসে চলিয়া যাইবে।

মাঝখানের এ কটা দিন এমনইভাবে মুখের সামনে সিগারেট টানিয়া, নির্বিকার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া, একা লাবণ্যকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, তার সবচেয়ে গভীর হতাশা ও বিষাদের মুহূর্তে পাশের ঘরে ঠুংরি সুরে গান ধরিয়া দাদাকে আঘাত দেওয়া ও অপমান করার কাজে লাগাইতেছে।

সদরের চৌকাঠ পার হওয়ার সময় চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনদিনে রমেশের গায়ের জ্বালা কমে নাই। আজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল। পয়লা কি দোসরা তারিখে লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তারপর কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলিবে। বিপদের কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, সংসারের সাধারণ কথা। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র সাপের মতো ক্রূর ভঙ্গিতে যে ফণা তুলিয়াছে, তার সঙ্গে যাচিয়া কীভাবে কথা বলা যায়।

সিগারেট খাক, সে জন্য নয়। ত্রিশ বৎসরের উপযুক্ত ভাই, সামনে খাইলেও দোষ হয় না। তবু একটু আড়াল দিবার, একঘরে থাকিলেও অন্তত তার পিছন দিকে জানালায় সরিয়া গিয়া সিগারেট টানিবার যে প্রথা ছিল, যুগযুগান্তের সংস্কারের চেয়ে সেটা কম বর্জনীয় নয়। রমেশ যে শত্রুতা করিতে চায় তার এত স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আর কীসে মিলিত ! একটি গাঁট ভাঙিলে শিকল ছিঁড়িয়া যায়, এই একটি নিয়ম ভাঙিয়া ভাই তার স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের বাঁধন ভাঙিয়া দিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে ছোটো ছেলেমেয়ে দুটি প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। একজনকে মারিয়া উপরে গিয়াছে উমা, আর একজনকে পিটাইতেছে পারুল। ব্যাপারটা বুঝিয়া ধনেশ মুখ খুলিতে না খুলিতে তড়বড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া কী জোরে ধাক্কা দিয়াই সে পারুলকে হটাইয়া দিল। বেহায়া নচ্ছার মেয়ে খাইয়া খাইয়া গায়ে তার এতই কি তেল বাড়িয়াছে, সময় নাই অসময় নাই ভাইবোনদের মারে ?

তুমি মারলে আমায় ! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু বললে না বাবা ?

পারুলের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাদাটে সরু গলায় তিন চারটা নীল শিরা ফাঁপিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।—থাকব না তোমাদের বাড়িতে আমি আর। নার্স হয়ে যাব—এক্ষুনি নার্স হয়ে যাব।

আঁচল ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া মেয়েকে থামাইয়া উমা বলিল, কোথা যাচ্ছিস ?

আমি এক্ষুনি শীলাদির কাছে গিয়ে নাম লেখাব। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে !

গা ধুইতে নীচে নামিয়াছে, গায়ে জামা নাই। ও সব যেন গ্রাহ্যও করে না, এমনিভাবে পারুল চেঁচাইতে থাকে। উমা আঁচল ছাড়িয়া না দিলে সে যেন বিনা কাপড়েই পথে বাহির হইয়া যাইবে, এমনই উন্মাদিনী মনে হয় তাকে। দেখিলে কল্পনাও করা যায় না, কয়েকমাস আগে এই পারুল ছিল ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত মেয়ে, চুপচাপ সংসারের কাজ করিত, মুখে ফুটিয়া থাকিত সলজ্জ নম্র হাসি।

তোরা কি আমায় পাগল করে দিবি ! ধনেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া লাবণ্য নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতেছে। নীচের উঠানে যা ঘটিতেছে সে সব যেন অজানা অচেনা প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যাপার, তার কিছু বলারও নাই করারও নাই। ভাসুর আসিয়া দাঁড়ানোর অনেক আগে হইতেই সে এইভাবে এইখানে দাঁড়াইয়া উদাসীনের মতো সব দেখিতেছিল। মাজা বাসনের তাড়া উমা পা দিয়া ছুঁড়িয়া দিল—দিক। দু বছরের শিশুকে বেদম মারিয়া উমা উপরে উঠিল,—উঠুক। খেলা ফেলিয়া পাঁচ বছরের মিনু উপর হইতে সাবান

আনিয়া দিতে না চাওয়ায় পারুল তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—করুক। মা যদি পাগলা গোরুর মতো মেয়েকে গুঁতায়, সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে যদি সদরের খোলা দরজার সামনে উঠানে কোমর পর্যন্ত উদলা করিয়া দাঁড়ায়, তাতেও তার কিছু আসিয়া যায় না। তার যে বাপ মা, ভাইবোন ওদিকে মরিয়া গেল, সাতদিন খবর আসে না !

লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া ধনেশ চিৎকার করিয়া বলিল, তুমি কি একবার নীচে নামতে পার না বউমা ?

লাবণ্য ইঞ্চি দুই ঘোমটা টানিয়া দিল। ভাসুরের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা শাঁখের ফুঁ পড়ে, ঘরে ঘরে ধুনা দেওয়া হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিবার আগে মাটির প্রদীপটি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মিনিটখানেকের জন্য আলো দিয়া আসে। কিছুই বাদ যায় না, সব বজায় আছে। রান্নাঘরে রান্না হইতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসিয়াছে, রমেশের ঘরে রেডিও বাজিতেছে, দুধ খাইয়া প্রতিদিনের মতো কোলে শুইয়া ঘুমানোর জন্য খোকা আসিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব বজায় আছে। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া, কাগজ পড়া, স্নানাহার সারিয়া আপিস যাওয়া, ছুটির পর বাড়ি ফেরা, খোকাকে ঘুম পাড়ানো, ছেলেমেয়েদের পড়া বলিয়া দেওয়া, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসা, খাওয়া এবং ঘুমানো। তবু সংসার তার বেঠিক বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া। বাহির হইতে একটা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত প্রচণ্ড শক্তি চুঁয়াইয়া চুঁযাইয়া তার সংসারের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ভিতর হইতে বিরামহীন সক্রিয় একটা শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের।

খোকাকে কোলে শোয়াইয়া অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে তাকে থাবড়াইতে থাবড়াইতে অবসাদে ধনেশের চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। এ আর পি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়াছে, জগদীশ আর ট্রামের সেই কাঁচাপাকা চুল বুদ্ধিমানের মতো চেহারার লোকটি বলিয়াছে, আজ রাত্রেই হয়তো কিছু ঘটিবে। এ চিন্তা মন হইতে দূর করিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। কিন্তু এই আতঙ্ক পর্যন্ত তার যেন আজ কেমন অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বুককাঁপানো উত্তেজনায় অবশ করা শিহরনের মতো মুহুর্মুহু শিরায় বহিয়া গিয়া মনকে দিশেহারা করিয়া দিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে আর একটা আতঙ্ক তার চেতনাকে দখল করিতে চাহিতেছে—বাহিরের বিপদ ঘটিবার আগেই তার ঘর ভাঙিয়া যাওয়ার, সর্বনাশ হওয়ার আতঙ্ক। একটা বিষ যেমন আর একটা বিষের ক্রিয়া নাকচ করিয়া দেয়, সংসারের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে খেয়াল করায় নূতন এক ভয় তার এই কদিনের ভয়কে দুর্বল করিয়া গিয়াছে।

জগদীশ ডাকিতে আসিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিল। পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েরা অবিরত ঝগড়া আর মারামারি করিতেছে। ওদের স্বাভাবিক দুরন্তপনার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া বেপরোয়া হিংস্র ভাব দেখা দিয়াছে। মেজাজ যেন ওদেরও তিরিক্ষে হইয়া উঠিয়াছে। তারপর এক সময় ছেলেমেয়েরা ভাত খাইতে গেল, উমার গালাগালি আর মার খাইয়া পলটুর আর্ত ও মিনুর নাকিসুরে কান্না ধনেশের কানে আসিতে লাগিল। চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। অবসাদ ধীরে ধীরে কেমন একটা মৃদু ও শান্ত নেশায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, দুর্বল জ্বরো রোগীর আলস্যের মতো। ঘরের বাহিরে বারান্দায় হঠাৎ পারুল আর লাবণ্যর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সেই পারুল আর সেই লাবণ্য ! সখীর মতো গলায় গলায় ভাব ছিল এই দুটি ভাসুরঝি আর কাকিমার। কাড়াকাড়ি করিয়া লাবণ্য সংসারের কাজ করিত, উমার ছেলেমেয়ে মার চেয়ে কাকিমার আদর পাইত বেশি। সংসারের কাজ করা লইয়া পারুলের সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিতেছে ! একতলা হইতে উমা চিৎকার করিয়া একটা বিশ্রী কথা বলিল লাবণ্যকে। লাবণ্য ঝাঁজালো গলায় জবাব দিল, তোমার খাই না পরি যে যা মুখে আসছে বলছ দিদি ?

লাবণ্য এত জোরে কথা বলিতে পারে ? এত কর্কশ তার গলা ?

অনেকক্ষণ পরে কী কাজে ঘরে আসিয়া ধনেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। উমা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি পাড়ায় দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে বাহির হইয়াছে। বাড়িতে তার তো চুপচাপ একা বসিয়া থাকা স্বভাব নয়, বাড়ি থাকিলে এতক্ষণ কত আলোচনা, কত পরামর্শ তার চলিতে থাকে।

কী হয়েছে গো ? আজ কিছু হবে নাকি ? ভয়ে উমার কথাগুলি প্রায় জড়াইয়া গেল।

শরীরটা ভালো নেই। পুলক ফেরেনি ?

না। ঘরে বসে আছ, খেয়ে তো নিতে পারতে এতক্ষণ ? সারারাত হেঁসেল আগলে বসে থাকব ?

সকালে চার বস্তা চাল, এক বস্তা ডাল এবং নুন, তেল, মশলা মুদি দোকান হইতে আনা হইয়াছিল। বাজারে গিয়াছিল মাছ তরকারি কিনিতে, রসিকবাবু এমন ভয় দেখাইয়া দিলেন যে মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আর ভরসা হইল না, ধার করিয়াই জিনিসগুলি কিনিয়া আনিল। মাস ছয়েকের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করা আছে তবু আরও কিছু অবিলম্বে এই দণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ফেলাই ভালো। মুদিওয়ালা কি সহজে ধার দিতে চায় ! বিশ বছরের যে খদ্দের, তাকে পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য বাকি দিতে সে নারাজ। বিকালে টাকা পাঠাইয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে ধনেশ জিনিসগুলি পাইয়াছিল।

পুলককে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে ফেরে নাই। কদিন সে বাড়ি ফিরিতে এমনই রাত করিতেছে। কোথায় যায়, কী করে ছেলেটা, কে জানে। সেও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তিন চারবছর আগে বয়স যখন তার পনেরো-ষোলো বছর, অকারণে তার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বভাব হইয়াছিল মেয়েদের মতো লাজুক, চোখ তুলিয়া কারও মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে বয়সের বদভ্যাস ছেলেকে ধরিয়াছে টের পাইয়া কত রাত্রি ধনেশের তখন ঘুম আসে নাই। তারপর ছেলের চেহারায় লাবণ্য ফিরিয়া আসিলে, স্বভাব স্বাভাবিক হইলে, ধনেশের যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। খাইতে খাইতে ধনেশের মনে পড়িল, কিছুদিন হইতে পুলকের চেহারা আর চালচলনে আবার যেন সেই আগেকার শোচনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেখিয়াও এতদিন সে দেখে নাই। চারিদিকের অস্বাভাবিকতার পীড়নে, তার দিশেহারা ভয়-ভাবনার ছোঁয়াচে, আবার কি ছেলেটা বিগড়াইয়া গেল ?

মুখে ভাত রুচিল না। অর্ধেক খাইয়া ধনেশ উঠিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল পুলকের। আজ একবার ভালো করিয়া ছেলেটাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে, তার কী হইয়াছে। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, সংসারের কাজ ফুরাইয়া গেল, নীচের ও উপরের আলোও নিভিয়া গেল। শুধু আলো জ্বালিয়া ধনেশ আর উমা বসিয়া রহিল ছেলের অপেক্ষায়। শ্রান্তিতে ধনেশের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শঙ্কায় মন তার সজাগ, সচেতন হইয়া রহিল।

পুলক ফিরিয়া আসিল রাত্রি প্রায় একটার সময়। গলিতে রিকশার আওয়াজ শুনিয়াই ধনেশ ও উমা নীচে নামিয়া সদর খুলিয়া দিয়াছিল। পুলক রিকশা হইতে নামিল, ভাড়াও মিটাইয়া দিল। সমস্ত শরীর শক্ত আর সোজা করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সময় চৌকাঠে পা বাধিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া ধনেশের ধমকে উমা চুপ করিয়া গেল। পুলক নিজেই তখন উঠিয়া বসিয়াছে।

ছেলেকে কড়া কথা বলার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। শ্রান্তকণ্ঠে অসহায়ের মতো সে শুধু প্রশ্ন করিল, মদ খেলি কেন পুলক ?

পুলক বলিল, কেন খাব না ? কদিন বাঁচব আর, তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দুদিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফুর্তি করে নি।—

সাড়ে সাত সের চাল

আঁধার রাত। গাঁয়ের নিঝুম পথ।

বেলে মাটির কাঁচা নরম পথে সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিল। পথের এই গুণের কথা সন্ন্যাসীর মনে ছিল না। স্টেশন থেকে তিন মাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরও চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌঁছবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। দেহ বড়ো দুর্বল, কোমর আর হাঁটুতে ব্যথা, মনে মনে সর্বাঙ্গের পুঞ্জীভূত ব্যথিত অবসাদ। প্রথমটা সন্ন্যাসী স্টেশনেই শুয়ে থাকবে ভেবেছিল। চার পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে স্টেশনের শেডটার নীচে চিতপাত হয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বাড়ির দিকে রওনা হবে !

কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবি লোক, কল্পনা করতেও ভারী পটু। সে হিসেব করে দেখল, সাত মাইল পথ তাকে হাঁটতেই হবে, রাতেই হোক বা ভোরেই হোক ! এক কাপ চা খেয়ে খিদেকে মেরে ফেললেও মরা খিদে রাত ভোর জীবনীশক্তি শুষে শুষে আরও একটু কাহিল করে ফেলবে তাকে। ঘুম ভাঙতে হয়তো তার বেলা হয়ে যাবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়তো এত দেরি হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাত সের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্ন ভোজনটা ফসকে যাবে।

হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কল্পনা করে—না খেতে পেয়ে ক জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে ! ক জন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে ! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে—তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে—তার সাড়ে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো—

সর্বনাশ !

সঙ্গে কিছু ছোলাও আছে। সন্ন্যাসী তাই কিছু ছোলা চিবিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে রাত্রেই রওনা দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদকে মোটে ক্ষয় করেছে চারটি তিথি। এমন জবর জ্যোৎস্নায় নরম পথে হেঁটে মনের মতো কষ্ট পাওয়া অসম্ভব। শালা, কী টানেই বাড়িটা টানছে তাকে, অনেকেই হয়তো যেখানে ভূত হয়ে গেছে মরে, সোনা বউঠান সুদ্ধ।

প্রথম গাঁ সালাতিতে বরাবর একপাল কুকুর থাকত। পথিকে গাঁ ভেদ করে যেতে গেলেই তাদের সমবেত চিৎকারে ঘুমন্ত রাত চিরকাল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন কাউকে তারা কামড়ায়নি, তাড়াও করেনি, শুধু হল্লা করেছে প্রাণপণে। তবু ভয় একটু করেছে পথিকের, হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। সন্ন্যাসীর হাতে লাঠি ছিল না, গাঁয়ে ঢুকবার আগে একটা ভাঙা বাড়ির বেড়া থেকে একখণ্ড রাখারি সে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। কিন্তু থপথপ পা ফেলে গাঁয়ের সীমানা সে পার হয়ে গেল, কুকুরের সে প্রচণ্ড কলরব তার কানে এল না। দু-চারটে খেঁকি কুকুর শুধু নির্জীব ভাঙা আওয়াজে একটু সাড়া জানিয়েই চুপ হয়ে গেল।

মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠান্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠল—গাঁ পেরিয়ে যাবার পর। এখানে পথের দু পাশে শুধু মাঠ আর জলা। সামলে নিতে থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সন্ন্যাসী চারিদিকে তাকায়, স্পষ্ট বুঝতে পারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল এই নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে মনটা

তার ছোটো হয়ে গেল। তারই আতঙ্কে মনটা কুঁচকে গেল, ভাঁজ হয়ে গেল। শালা, চোখেও যে ঝাপসা দেখছে !

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগেই সন্ন্যাসী কায়দা করে বসে পড়ে পথে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের তালুতে। কতকাল সে পেট ভরে খায়নি, প্রাণপাত করে শুধু খেটেছে। মাঝে মাঝে এ রকম হয় তার খানিক পরেই কেটে যায়।

খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করল। হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হল শরীর যেন তার হালকা হয়ে গেছে, তার কোনো বোঝা নেই ! চালের পুঁটুলি কাঁধে নেই, সেই পুঁটুলির বাড়তি কাপড়টুকুতে বাঁধা ছোলাগুলিও সেই সঙ্গে গেছে। কোথায় পড়ল ? কখন পড়ল ? কুরু কুরু কুরু করতে লাগল সন্ন্যাসীর পিঠের খানিকটা মেরুদণ্ড। তার হিসাব, তার কল্পনা, সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরে পড়তে গিয়ে যেখানে বসে পড়েছিল সেইখানেই যে পুঁটুলি দুটির থাকার সম্ভাবনা বেশি, এটুকু খেয়াল করে আশান্বিত হবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উলটো দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু গিয়েই পুঁটুলিটা পড়ে আছে দেখেও তার বিশেষ ভাবান্তর হল না। পুঁটুলির পাশে বসে মস্ত একটা আটকানো নিশ্বাস ফেলে সে শুধু নিশ্চল হয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল।

পলাশমতির কাছে পৌঁছে সন্ন্যাসীর মনে হল, সে যেন আবার আগের গাঁ সালাতিতেই ঢুকতে যাচ্ছে। পথের ধারে সালাতির যে প্রথম ভাঙা বাড়ির ভাঙা বেড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাখারি সংগ্রহ করেছিল, পলাশমতিতে প্রবেশ পথের ধারেও তেমনই একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্ছার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়ি শূন্য, মানুষ নেই।

বাঞ্ছা !

সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু-একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনই ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে আর সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে—নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞাসা করল, কে ? সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোনো কিছুর চলার মচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট-ন বছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়েনি এখনও। বেড়া নেই। পাশের ছোটো কলাবাগান আর সবজি খেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।

দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলেছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি। কোনো মতে কুড়িয়ে পেতে একমুঠো দুমুঠো খেয়ে মরোমরো অবস্থায় ছেলে-বুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।

মনাদা !

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকল সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

মনাদা।

সাড়া নেই।

সুবল কাকা।

সাড়া নেই।

সুখী পিসি !

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিল।

সোনা বোঠান।

সাড়া নেই।

সোনা বোঠান ! সোনা বোঠান !

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালাব দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আর একটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

ভিতরের দুটি ঘরের একটিতে দরজার উপরে শিকলে তালা আঁটা, দরজার পাট থেকে ভেঙে খসে এসে শিকলটা ঝুলছে। অন্য ঘরটির দুয়ার সপাটে খোলা।

কোনো ঘরে কেউ নেই। তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই ? দাওয়ায় সাড়ে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচেছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধু ? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল ?

কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধু ?

ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।

প্রাণ

মালতীর ফিরতে আজ দেরি হচ্ছে। বেশি রকম দেরি হচ্ছে। কোথায় উঠে গেছে সূর্যটা আকাশে। ক্লেশকর একটা অনুভূতি পাক দিতে থাকে অটলের মধ্যে তার একঘেয়ে একটানা চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে। মালতীকে আজ সে খুন করবে, নিশ্চয় খুন করবে, যদি—হ্যাঁ, অবশ্য যদি কাজ সে হাসিল করে না আসে। দেরি হোক মালতীর, দেরি হওয়া তার আশ্চর্য নয়, তাতে কিছু এসে যায় না। সে জন্য অটলের রাগ বা জ্বালা নয়। মালতী ফিরে এসে যদি জানায় আজও বাবুর সাথে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে আসতে পারেনি, লজ্জায় ভয়ে পারেনি, তা হলে অটল ফেটে যাবে রাগে : মালতীকে টের পাইয়ে দেবে তার রাগ কী জিনিস, তার অবাধ্য হওয়ার ফল কী। সে অবশ্য পরের কথা। সব ঠিকঠাক করেই হয়তো আসবে মালতী। দেরি হয়তো হচ্ছে সেই জন্যই। বাবু তো আবার মান্যিগন্যি মানুষ, সুযোগ সুবিধা আড়াল না পেলে মালতীর সাথে কথাই বা বলবে কী করে, লোকে দেখলে বলবে কী ! মালতীও হয়তো হাঁ করে আছে সুযোগের জন্য, মেয়ে মানুষ তো। তবে, শকুনটার নজর যখন পড়েছে মালতীর ওপর, মালতীর কথায় রাজি সে হয়ে যাবে। খুশি হয়েই রাজি হবে, বেশি রকম আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যাছ্যা করে। জনপ্রাণী থাকলে মালতী পারবে না, তার ভয় হবে লজ্জা করবে, এতে খাঁটি গেঁয়ো ভীরু লাজুক বউ বলে মালতীর দাম বাড়বে ব্যাটার কাছে। কী বোকাই সে বনবে অটলের বুদ্ধিতে—সে আর মালতী দু জনেই !

কতকাল ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে, উপোস করে দিন কাটাচ্ছে কী অবস্থায় লজ্জা ঘেন্না বরবাদ করে, আজও সে আছে ভীরু লাজুক গেঁয়ো বউ ! চোখের সামনে কতলোকের কত বউকে কী হয়ে যেতে দেখল অটল, নিজের বউ বলে যেন বাদ পড়েছে মালতী। মালতী অবশ্য বলে যে আজও সে সতী আছে। পেটের দায়ে ছাড়াছাড়ি হোক তাদের সকালে দুপুরে, ফিরতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যাক যেদিন যেমন কাজ জোটে সারতে, তাই বলে সে অসতী হবে কেন, মুখপোড়া বজ্জাত !

মালতী ঝগড়া করে, গাল দেয়, কাঁদেও। কে জানে, তাই হয়তো হবে। এত দুর্দশা সয়েও তাকে তো আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে এই ভাঙা নোংরা চালায় শেয়াল কুকুর তাড়িয়ে। হয়তো তাই হবে !

কিন্তু মালতী সব ভেস্তে দিয়ে এলে তার যে জ্বালা হবে সে কথা ভেবে এখন থেকে দগ্ধ হচ্ছে অটল।

হীরু, খলিল, রাধারা ফিরে এসেছে ছোটো মগের কম মাপের পাতলা খিচুড়ি নিয়ে। আর যা কিছু জোটাতে পেরেছে মিলিয়ে একসঙ্গে একবারে খাবে, নইলে মনে হয় যেন এক চুমুক একটু নোনা ঘন জল খাওয়া হল। ভাঙা পোড়ো বাড়িটার সব আনাচ-কানাচ ওরা দখল করে আছে, যে কটা ঘরের আধখানা সিকিখানা ছাদ ঝুলে আছে তার নীচে, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে থাকলেও সরু ইটের ভাঙা দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে থেকে দুদিক তিনদিক যেখানে আড়াল করছে। সিদ্দিকের বউ সেদিন মারা পড়েছে সাপের কামড়ে। প্রথম এসে অটল ওখানে আশ্রয় খুঁজেছিল। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলের হোক, তার জন্মের আগে থেকে পরিত্যক্ত হোক, ইটের বাড়ি তো, সঙ্গীও আছে। ওরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দল বেঁধে হইহই করে, তাদের এই ভাঙা চালার আশ্রয় থেকে এখন তারা যেমনভাবে কুকুর তাড়ায়।

যাসনি বুঝি ? হীরু শুধিয়েছিল ফিরবার সময় দশজনকে শুনিয়ে, অ ! তোর বউ—ই তো গেছে !

দু মাস কি তিন মাসের ছেলে রাধার বুকে—বুক আর কই, শুধু পাঁজর। চিঁচি গলায় সে শুনিয়েছিল, মরণ হয় না ? শরম লাগে না ? বেহায়া বাঁদর ?

ওদের হাসি টিটকারির মানে ছিল সোজা। ওরা টের পেয়েছে, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর দিকে। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চালা আর নর্দমার মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অটল টানছিল কাল সন্ধ্যায় স্টেশনে কুড়ানো আধপোড়া চুরুটটা। সেই থেকে একটা অসহ্য অনুভূতি কেবলই পাক দিয়ে উঠেছে অটলের মধ্যে : মালতী যেন এসেই গিয়েছে সব কিছু ভেস্তে দিয়ে। মালতীর দিকে নজর পড়েছে বাবুর ! মালতী এনে দিচ্ছে আর ঘরে বসে সে রাজভোগ খাচ্ছে ! ওরা কি জানে কাল থেকে একটু খিচুড়িও সে খায়নি—একটু দেরি হওয়ায় তারা পায়নি খিচুড়ি। কোথাও কিছু জোটোনি কাল তাদের, কাজে যায়নি মালতী, তার চাপড় খেয়েও যায়নি। এক বেলা পেট ভরল না, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর ওপর।

ধুলায় ধূসর হয়ে মালতী ফিরে আসে। কাপড় তার মাটির মতোই ময়লা, তারও ওপর আর এক পরত ধুলোর আস্তরণ পড়েছে বেশ বোঝা যায়। বড়ো রাস্তায় সারাদিন অফুরন্ত ট্রাক চলাচল করে চারিদিক কাঁপিয়ে, ঘন হয়ে ধুলো ওড়ে চারিদিক অন্ধকার করে।

ভর্তি থলিটা মালতী কাঁখে নিয়ে আঁচল দিয়ে ঢেকে আড়াল করে বয়ে এনেছে। নামিয়ে রেখে সে আস্তে আস্তে হাঁপায়। এইটুকু থলি ! এক কাঁখে ছেলে, আর এক কাঁখে জলভরা কলসি বয়েছে মালতী ওবছর, ধানসেদ্ধর হাঁড়ি নামিয়েছে অবহেলায়। তখন খাসা চেহারা ছিল ওর। শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে আজ, হাড়গুলি *ঠেলে ঠেলে* উঠেছে। তাই বুঝি ভালো লেগেছে বাবুর। ছিপছিপে গড়ন, বয়স কম লাগে—। ছ্যাছ্যা করে অটল মনে মনে।

কী আনলি ?

অনেক কিছু দিয়েছে বাবু মালতীকে থলি ভর্তি করে। চাল ডাল তরকারি—আলু বেগুন শিম আর আস্ত একটা বাঁধাকপি। শালপাতায় জড়ানো খানিকটা মাংস। মিকচারের শিশি ভরা সোনালি সরষের তেল। পুরানো একখানা সাঁফ ধুতি আর সাবান—কার্বলিক সাবান।

চেয়ে চেয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দ্যাখে অটল, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মালতী। মিনতি করে বলে, ভরে ফ্যালো—ঢেকে ফ্যালো।

চারিদিকে ফাঁক, বাবু যা আগাম দিয়েছে কে দেখে ফেলবে কে জানে ! চোখের পলকে রটে যাবে চালায় চালায় পোড়োবাড়ির আশ্রয়ে আশ্রয়ে, কত কী উপার্জন করে এনেছে মালতী, হিংসায় বিদ্বেষে জ্বলে যাবে কতগুলি বুক, কথায় বিঁধে বিঁধে পাগল করে দেবে মালতীকে।

নে নেকামি রাখ। বেলা দুপুর হল, রাঁধবি কখন খাবি কখন ?

বাঁধাকপিতে হাত বুলায় অটল, টিপে টিপে দেখে—নারকোলি বাঁধুনির খাসা ঠাসা কপি। ও বছর বাড়ির লাগাও জমিটুকুতে সে কপি লাগিয়েছিল গন্ডা সাতেক। কী তেজি আর ভারী হয়েছিল কপিগুলি। বিশটা কপি বেচে দিয়েছিল পঞ্চুকে—ঠক, চোর, বেজন্মা পঞ্চু ব্যাটাকে। বোকা পেয়ে কী ঠকানটাই তাকে ঠকিয়েছিল। আর শুধু পঞ্চুই বা কেন ? নকুড়বাবু, জাফর মিয়া, নায়েববাবু ঠকাতে ছেড়েছে কে তাকে ধানে, জমিতে সব দিক দিয়ে ?

প্যান প্যানিয়ে কী বলছে মালতী ? শুধু চাল, ডাল সে হাঁড়িতে চড়াতে চায়, অন্য সব আজ তোলা থাক, লুকানো থাক। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, লোকেও টের পাবে না তারা বিশেষ কিছু রান্না করে খাচ্ছে !

হাঁড়িতে তরকারি ছেড়ে দি, শিগগির হবে, তেল নুন মেখে—

বাবুর সঙ্গে মালতী সব ঠিক করে না এলে যে রকম রাগ করবে ভেবেছিল, সেই খুন করা রাগে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অটলের। চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে মালতীকে সে মাটিতে পেড়ে ফেলে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে হন্যে কুকুরের মতো দাঁত বার করে ফোঁসে, খেয়ে এয়েছিস বুঝি পেট পুরে ?

খেয়ে এলে এত জিনিস দিত ? দমের সঙ্গে আর্তনাদ আটকে মালতী বলে ফিসফিসিয়ে, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলে রাধা, মতি, বিদুর মা, সুবালা এরা সবাই হয়তো ছুটে আসবে, টের পেয়ে যাবে সব।

মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব, ন্যাকামি করবি যদি। বলে অটল তাকে রেহাই দেয়। অটলের খুশিমতো রান্নার সমারোহ হবে। ভাত আর ডাল ভিন্ন ভিন্ন নয়—তাতে অনেক সময় লাগবে, উপোসি অটলের অত ধৈর্য নেই। চাল ডাল এক সাথে চড়ুক এক হাঁড়িতে, তাতে সিদ্ধ হোক কয়েকটা আলু আর শিম। বেগুন একটা পোড়া দেওয়া হোক উনানে। মাংস দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি হোক অন্য উনানে ভাঙা কড়াইটাতে—অন্য উনান কই ? সে ভাবনা মালতীর কেন !

পোড়া বাড়ির ইটের স্তূপ থেকে ইট এনে অটল উনান বানিয়ে দেয়। পোড়োবাড়ির পিছনের জংলা বাগান থেকে শুকনো ডালপাতা কুড়িয়ে এনে দেয় তিন দফায়—তারপর আর একবার জ্বালানি সংগ্রহের চেষ্টায় বার হতে গিয়ে থমকে থেমে পেটে কবার হাত চাপড়ে চাপড়ে বলে, আমি এক নম্বর বোকা ! জানিস বউ, এক নম্বর বোকা আমি ! টান দিয়ে বেড়ার খানিকটা পেড়ে ফেলে সে মালতীর দিকে এগিয়ে দেয় উনানে গুঁজবার জন্য। দ্যাখ দিকি খেয়াল হয়নি, আজ এখানে শেষ। বেড়াটা থেকে আর কী হবে ? মিছে ছুটোছুটি করে মরলাম জ্বালানির লেগে।

কেন এমন করতেছ ? মালতী বলে কেঁদে কেঁদে, ওরা এসে শুধালে কী বলবে কোথা এত জিনিস পেলে ? চুপচাপ থাকো তোমার পায় ধরি।

শুধাবে ? কে শুধাবে ? মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব না !

মালতী কাঁদছিল আগে থেকেই কিন্তু এবার এতক্ষণে সেটা খেয়াল হয় অটলের। খিদের জন্য তো নয়, খিদে মরে গেছে অনেকদিন, একবেলা পেট ভরে খাবার জিদে তার যেন নেশা হয়েছিল, গায়ে জোর বেড়েছিল। আর কিছু করার নেই, বসতে না বসতে ঝিম ধরে সে ঝিমিয়ে যায়। কদিন থেকে মালতীর এমনই ধরনধারণ ধাঁধার মতো লাগছে তার কাছে। কদিন থেকে ? বাবু যেদিন লোক মারফত ওকে বিশেষ টিকিট পাইয়ে দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দুধ খাইয়েছে, শিশু আর প্রসূতিদের বরাদ্দ দুধ, সেদিন কি তার পরদিন থেকে। বেশ তিরিক্ষে কাঠখোট্টা হয়ে উঠছিল মালতী গেরস্ত ঘরের বউ মানুষের হায়াটায়া সব ভুলে গিয়ে, মতি রাধা এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাকচতুর হয়ে উঠেছিল একটু বেশি আদায় করার ফন্দিফিকিরে, কথা বলতে শিখছিল চটাং চটাং। মতি রাধাদের সঙ্গে খেঁকি কুকুরের মতো সমানে সে ঝগড়া চালিয়েছে, মুখে তুবড়ি ছুটিয়েছে নতুন শেখা নোংরা কথার ! বাবু ক দিন দুধ আর খাবার খাওয়াবার পর থেকে কেমন যেন সে ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে, শান্ত ভালো মানুষ হয়ে গেছে। ঘর ছাড়ার পর ঘরের কথা গাঁয়ের কথা অটল কোনোদিন শোনেনি ওর মুখে, এই কদিন মাঝে মাঝে কী যেন ভাবতে ভাবতে আনমনে ঘর সংসার আপনজন চেনা মানুষের কথা সে বলে—পুরানো হারানো দিনের কথা। এতকাল পরে হঠাৎ নতুন করে যেন ওর ঘর সংসারের জন্য কষ্ট আরম্ভ হয়েছে।

রান্না শেষ করে খেয়ে উঠতে বেলা পড়ে আসে। খেতে সময় লাগে খুব কম। যে রকম ভোজ খাবে ভেবেছিল অটল তা হয় না, অল্প খেয়েই পেট ভরে যায়, জিভে স্বাদ লাগে না। না খেয়ে না খেয়ে খাওয়ার ক্ষমতাও গেছে। তবু এ পেট ভরেই খাওয়া, দিনের পর দিন যা খেয়ে পেট ভরত না তার দশগুণ তো বটে—পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন। খেতে খেতেই কীসের যেন ঝাঁঝ, কত যেন জ্বালা

জুড়িয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করে অটল, একটানা একটা যে অদ্ভুত আওয়াজ প্রায় অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে দুই কানে। খেয়ে উঠে অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হতে থাকে প্রথমটা, হঠাৎ ওজন বেড়ে দেহটা যেন দশগুণ ভারী হয়েছে, ভেতর থেকে বুকে কীসের চাপ পড়ায় শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, মাথাটা হয়ে গেছে হালকা, শূন্য। তারপর ঘনিয়ে আসে গভীর আলস্য আর অবসাদ। দুঃখ কষ্ট অস্বস্তি জ্বালাবোধ সব কমে গিয়ে সৃষ্টিসংসার বুঁদ হয়ে আসে নেশায়, গভীর ঘুমে।

অটলের যখন ঘুম ভাঙল, রাত্রি হয়ে গেছে। এমন খাপছাড়া অদ্ভুত লাগে তার নিজেকে যে খানিকক্ষণ ধাঁধা লেগে সে থ মেরে থাকে। গাঁয়ে নতুন খড়ের মোটা চালার নীচে মাটির পুরু দেওয়াল ঘেরা তার নিজের ঘরেই যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তামাক টানার ইচ্ছায় কাতর হয়ে। হাত তার দু-তিনবার প্রায় এগিয়ে যায় পাশে মালতীকে ঠেলে দিতে, গলা দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসে তামাক দিতে বলার কথা · রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে তামাক সেজে দিতে বললে মালতী রাগ করত না। তার জানা ছিল, তামাক খেয়ে অটল তাকে আদর করবে।

মালতী আগেই উঠে বসেছিল।

সশব্দে প্রকাণ্ড হাই তুলে অটল জিজ্ঞেস করে, ডাকলি না যে ?

ঘুমুচ্ছো, কী হবে ডেকে।

গলা ভারী মালতীর, বোধ হয় কাঁদছে। তেমন উদ্ভট লাগে না কান্নাটা এখন। গা জ্বালা করে না। শুধু মনে হয়, মালতী যেন অনেক দূরে বসে কাঁদছে।

যাবি না ?

আরও রাত হোক।

খেয়ে নিলে হত না ?

পরে খাব। তুমি খাবে তো খাও।

থাক, এক সাথে খাব।

অটলের গলা আশ্চর্য রকম মিষ্টি লাগে মালতীর কাছে, অনেকদিন শোনেনি। গলাটাই কেমন কর্কশ হয়ে গিয়েছিল তার, মাঝে মাঝে মিষ্টি কথা বলতে চাইলেও কড়া শোনাত। মালতী তাই অনেকদিন পরে জোরে কেঁদে ওঠে আদর-চাওয়া ভরসা-চাওয়া পুবানো কান্না।

আমি যাবনি। ডর লাগছে মোর।

অটল খিঁচে ওঠে না, ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলে না যে পথে-ঘাটে গন্ডা গন্ডা পুরুষ নিয়ে যার কারবার, বাবুর মতো ভদ্দরলোকদের কাছে একটা রাত কাটাতে তার ডর লাগছে ! হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরে মালতীর, ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে, তোর ডরটা কীসের ? একটা রাতও পুরো নয়। বাবু ভদ্দর লোক, লেখাপড়া জানা লোক, গুন্ডা তো নয়, তোর ডরটা কীসের ? একটু না করবি তো এমনই দিন কাটবে মোদের ? দুদিন বাদে সেই তো পড়বি দালালের হাতে, নয়তো ক্যাম্পে যাবি, ছিনিমিনি খেলবে তোকে নিয়ে ? তার চেয়ে বরং একটা রাত, একটা রাতও পুরো নয়, মদটদ খেয়ে বাবু বেহুঁশ হয়ে ঘুমোলে দোর খুলে দিবি মোকে——

বলতে বলতে বাইরের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চালার আবছা অন্ধকারে হুড়মুড় করে এসে ভিড় করে তাদের গত মাসগুলির বীভৎস অভিজ্ঞতা—ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি, মৃত্যু। অটলের গলা কর্কশ হয়ে উঠতে থাকে, খেঁকি কুকুরের আওয়াজের আভাস আসে।

রাতারাতি উধাও হয়ে যাব দুজনে যা পারি বাগিয়ে নিয়ে। সুখে থাকব। বাবুকে বলেছিস তো বাড়িতে লোক থাকলে যাবি না ? লজ্জা করবে ?

বলেছি। মালতীর গলাও এবার শুকনো।

রাত বাড়ে। দূর থেকে একটা হল্লার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিল, ক্রমে সেটা থেমে যায়। পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাধা খ্যানখ্যানে গলায় খানিকক্ষণ পলাতক একটা মানুষকে গাল দিয়ে শুতে যায়। ও বেলার রান্না অন্নব্যঞ্জন অন্ধকারে বসেই তারা খায়। কলসির জল ফুরিয়ে এসেছে, তলার জলটুকু খেতেই শেষ হয়ে যায়। অটল ছেঁড়া ন্যাতায় এঁটো হাত মুখ মুছে নেয়। রাত আর একটু বাড়লে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়ে। ছোটো একটি পুঁটলি সঙ্গে নেয় অটল। কীই বা আছে নেবার। কাঁথাকানি চট মাটির হাঁড়ি কলসি ভাঙা কড়াই নিয়ে কী হবে।

কোথাও আলো নেই, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন। কুকুরগুলি ছাড়া এরই মধ্যে চারিদিকে সব মরে গেছে। বড়ো রাস্তায় লরি চলার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়েছে। বটতলায় কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মানুষ। জীবনে প্রথম চুরির কথা ভেবে অটলের এখন বেশ ভয় করে, কেঁপে উঠে আঁকুপাঁকু করতে থাকে বুকটা। কদিন ধরে সব পরিপাটিরূপে ছক কেটে রেখেছে মনের মধ্যে, ভয়ের কথা মনেও আসেনি। নিজেই চাকর ঠাকুর সরিয়ে দিয়ে বাবু থাকবে একা, মদের নেশায় উপভোগের শ্রান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোবে। জাগেই যদি নেহাত, লোহার এই যে ডান্ডা নিয়েছে অটল কাপড়ের তলে মালতীকে না জানিয়ে, তার এক ঘায়ে আবার বেহুঁস করে দেবে। কে চুরি করেছে জানাজানির ভয় তো সে করে না, জানাজানি যে হবেই কাজটা কাদের, অটল তা জানে। কাজ হাসিল করে পালাতে পারলেই তার হল। দরকার হয়তো মালতীকে ফেলে একাই নয় সে পালাবে। তবে তার ভয়টা কীসের ? আজকের আগে তো এ অন্ধ উদ্‌বেগ আর এলোমেলো দুর্ভাবনা তার ছিল না। ভয়ের বদলে বরং উল্লাস জাগত বাবুর টাকাপয়সা সব নিয়ে ভাগবার কথা আর দরকার হলে বাবুর, মাথায় ডান্ডার ঘা বসাবার কথা ভাবলে, ভিতরের অকথ্য একটানা জ্বালা যেন খানিকটা জুড়িয়ে আসত, মনে হত তাকে যেমন মেরেছে আর মারছে সবাই, একটু তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বাবুকে মেরে। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে ওঠার পর জ্বালাটা যেন জুড়িয়ে গেছে অনেক। তখন থেকে ভয় ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করেছিল, এখন স্পষ্ট আর প্রবল হয়ে উঠেছে।

রাতে আবার না খেলেই হত। শরীরটা ভারী লাগছে, অবসাদ বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এত সব হাঙ্গামা না করে যদি ভাঙা কুঁড়েয় খড়ের বিছানায় মালতীকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকতে পারত, শুয়ে থাকলে চলত।

উপোসি পেটে একটু অন্ন পড়তেই কেমন করছে প্রাণটা।

পুরানো প্রাচীর ঘেরা মাঝারি সাইজের বাগানের মাঝখানে পুরানো বাড়ি ভেঙে কে নতুন বাড়ি করেছিল, জবরদস্তি সরকারি দখলে এসে এখন বাবুর বাসা হয়েছে। কাঠের গেট খোলাই ছিল খানিকটা। গেটটা চেপে ধরে মালতী দাঁড়িয়ে পড়তে আস্তে তার কোমরে একটা গুঁতো দিয়ে অটল ফিসফিসিয়ে বলে, যা। ডর নেই। খানিক বাদে ওদিকে ঘুরে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পিছনে লুকিয়ে থাকব, বাবু ঘুমুলে খিড়কি খুলে ডাকিস।

মালতী গেটের ভেতরে ঢোকে, আস্তে গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে অটল সরে পড়ে। বুক তার ঢিপ-ঢিপ করছে ভয়ে, উত্তেজনায়। নিজেকে সে গাল দেয় মনে মনে, লাঙল নিয়ে মাঠচষা বলদের লেজ-মলা গেঁয়ো চাষা, তাকে দিয়ে আর কত হবে ! কেবলই তার মনে পড়তে থাকে, সে পুরুষ, মালতী মেয়েলোক। তার যদি এই অবস্থা, মালতীর দশা না জানি কী হয়েছে ।

বাবুর বাড়ির পিছনে কুয়োর কাছে গোরু-বাঁধা চালাটার ছায়ায় জবাগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে বসে একটু বেপরোয়া দুঃসাহসের জন্য সে ভিতরে ভিতরে আকাশ-পাতাল হাতড়িয়ে মাথা কপাল খোঁড়ে। সাহস আসে অদ্ভুত রকমের, যা দিয়ে তার কোনো কাজ হবার নয়। এখানে চুপটি মেরে ঘুপটি মেরে বসে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবুর মাথায় এখুনি লোহার ডান্ডাটা বসিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল

করার ইচ্ছাটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয় এ ভাবেই কাজটা সহজে হবে, ভয়ভাবনার কিছু থাকবে না। দূরে পেটাঘড়িতে এগারোটা বাজে। বাবু কি এখন হাত ধরেছে মালতীর ? কাপড়ের নীচে লোহার ডান্ডাটায় হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে অটলের। পেটাঘড়িতে হয় তো বারোটা বাজবে, একটা বাজবে, তারপর মালতী আসবে খিড়কির দরজা খুলে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব অটলের পক্ষে ! আর এক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব।

মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে অটলের। মালতী ভেতরে গেছে, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা না ভেঙে বাড়ির মধ্যে তার ঢুকবার উপায় নেই। হাঙ্গামা করলেই সর্বনাশ। কোনো রকমে যদি সে ঢুকতে পারত বাড়ির মধ্যে এই দণ্ডে। ঢুকেই তা হলে ডান্ডাটা বসিয়ে দিত বাবুর মাথায়। সব চুকেবুকে যেত। মালতীও রেহাই পেত। কী ভুলটাই হয়ে গেছে ! বাবু ঘুমোলে মালতীকে দরজা খুলতে বলার বদলে মালতীর পিছু পিছু খোলা দরজা ঠেলে সে যদি ভিতরে যেত, ডান্ডার এক ঘায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত বাবুকে !

ও বেলা আর এ বেলা পেটে বোঝাই করা পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন যেন তাপ হয়ে তার রক্তকে গরম করতে থাকে, শক্তি হয়ে দৃঢ় করতে থাকে পেশি আর স্নায়ু। অনেকদিন পরে পেট ভরে খাওয়ার প্রথম নেশা আর অবসাদ কমতে কমতে পেটাঘড়িতে বারোটা বাজলে অটলকে পুরোপুরি সজীব, প্রাণবন্ত করে দেয়। আর সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না মালতীর অপেক্ষায়। বাড়ির চারিদিকে একবার পাক দিয়ে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে সজাগ সজীব মনে হলেও উগ্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য তার কেটে গিয়েছে। গুরুভার বিষাদে থমথম করছে ভেতরটা। মনে এসেছে ধীর স্থির একটা সংকল্প। বাবু যদি বেঁহুশ হয়ে ঘুমিয়েও থাকে, জাগবার এতটুকু লক্ষণও দেখা না যায়, তবু সে লোহার ডান্ডাটা মারবে বাবুর মাথায়। একেবারে শেষ করে দেবে !

দুদিন তাকে দিয়ে এই বাগান বাবু সাফ করিয়েছিল। মজুরি দিয়েছিল কয়েক গন্ডা করে পয়সা। বাগানের মালির কাজটা পাবার জন্য সে বাবুর পায়ে ধরেছিল। বাবু দিয়েছিল ধমক, তার সরকারি মালি এসে গেছে। তাই না এই অবস্থা আজ তার।

দুটি একটি ছাড়া সব জানালা বন্ধ পিছনের আর পুবদিকের। খোলা জানালায় মোটা পর্দা। একটা জানালার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বোঝা যায় ভেতরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাবুর কি আর ঘুমের তাগিদ আছে আজ। কতরাত অবধি ফুর্তি চলবে কে জানে ! দাঁতে দাঁত লেগে যায় অটলের। সামনের দিকে গিয়ে সদর দরজাটা সে আস্তে ঠেলা দেয়। যদি ওরা ভুলে গিয়ে থাকে দরজাটা বন্ধ করতে ! না, দরজা বন্ধই আছে।

পশ্চিম দিক ঘুরে বাড়ির পিছনে ফিরে যেতে গিয়ে অটল থমকে দাঁড়ায়, বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, আর্ত চিৎকার ঠেলে আসে, হাতটা উঠে যায় মুখে। গাঁদা ঝোপের মধ্যে ঘুপচি মেরে বসে আছে সাদা ধবধবে কাপড় পরা একটা মানুষ। একদিন পেটভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে কতটুকু আর শক্তি আসে মাসের পর মাস ধরে উপবাসক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ দেহমনে, যুগযুগান্তের সঞ্চিত স্তূপাকার অন্ধ আতঙ্কে আলোড়িত হয়ে সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে মূর্ছার উপক্রম হয় অটলের।

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে মালতী বলে, আমি, শুনছো, আমি।

সম্বিৎ ফিরে এলে প্রথমেই অটলের মনে আসে, তাই বটে, মালতী বাবুর দেওয়া ধোপদুরস্ত ধুতিটা পরেছিল বটে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা মালতীকে ওখানে গাঁদাবনে ঘুপটি মেরে বসে থাকতে দেখলে সে নিশ্চয় এমনভাবে ডরাত না, চিনতে পারত।

দুহাতে গাঁদা গাছ সরিয়ে কাছে গিয়ে অটল উবু হয়ে বসে, দুমড়ে মুচড়ে যায় গাঁদা গাছ তার পায়ের নীচে, জোরালো গন্ধ ওঠে গাঁদার !

কী হল ?

আমি—আমি যাইনি।

ভেতরে যাসনি ?

উঁহু।

ভয়ে কাঁপে মালতী, শব্দ করার ভয়ে খুব আস্তে চেপে চেপে ফুপিয়ে কাঁদে ছোটো ছোটো ফোঁপানি করে। অটল চাপা গলায় বলে, চুপ। কাঁদিসনি। চুপ। ভেতরে যাসনি একেবারে ? দেখা হয়নি বাবুর সাথে ?

না। খানিক আগে বাবু বেরিয়ে গেটতক গেল, তারপর ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল দোরে।

আগে যাসনি কেন ?

মালতী জবাব দেয় না। অটলের শান্ত শ্রান্ত গলার আওয়াজে তার ভয় খানিকটা বোধ হয় কমে যায়। আর ফোঁপাবার উপক্রম করে না। খুন যে করবে বলেছিল, খুন যে করতে চায়, সে কি এমন সুরে কথা কয় ?

অটলের গলা আরও শ্রান্ত শোনায় : সেই থেকে বসে আছিস এখেনে ?

হাঁ। এখান থেকে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল !

পশ্চিমে হেলানো ছোটো চাঁদের তেরছা ক্ষীণ আলোয় কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে বাবুর বাগানের গাঁদাবনে। কালকের খাওয়া কুলিয়ে যাবে থলির বাড়তি চাল ডাল তরকারিতে, পরশু কী খাবে তাই ভাবে দুজনে, পরশুর পরদিন—

আর কী হবে। চল ফিরে যাই।

গেট দিয়ে বেরিয়ে দুজনে তারা ফিরে চলে তাদের ভাঙা চালার আশ্রয়ের দিকে। চলতে চলতে মালতীকে ভালোভাবে শোনাবার জন্য একবার তার গায়ে হাত দিয়ে অটল বলে, কি জানিস, এ সব মোদের কাজ নয়কো।

রাসের মেলা

আজ রাস পূর্ণিমা। রাসের মেলা বসেছে শহরতলির খালধারের এই রাস্তা আর দুপাশে যেখানে যেটুকু ফাঁকা ঠাঁই আছে তাই জুড়ে। নামকরা মস্ত মেলা, প্রতিবছর হয়। দোকানপাট বসে অনেক, দূর থেকে বহুলোক আসে কেনাবেচা করতে, অনেকে সারা বছরের দরকারি মাদুর পাটি বঁটি-দা হাতা খুন্তি ঝুড়ি ধামা কুলো ঝাঁটা গেলাস বাটি থালা কেনে এই মেলাতে। মনোহারি কাজের জিনিস ও শখের জিনিস, জামা-কাপড়, খেলনা-পুতুল, খাবারদাবার এ সব যতই কেনাবেচা হোক, আসলে গেঁয়ো কারিগরের তৈরি গেরস্তের ওইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাবেচাটাই মেলার বৈশিষ্ট্য। পাশে ফাঁপতে পারে না, রাস্তা চওড়া কম, একপাশে নর্দমার খাতটা আরও সংকীর্ণ করেছে রাস্তাটাকে, মেলা তাই লম্বায় বড়ো হয়। হরদম লরিগাড়ির চলনে এবড়ো-খেবড়ো বড়ো রাস্তাটা খাল ডিঙিয়েছে কংক্রিটের পুলে উঠে। পুলের খানিক এদিকে ডাইনে গেছে মেলার রাস্তা খালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আধমাইল দূরে রেললাইনের তল দিয়ে উত্তর মুখে সোজা। মেলা বসে রাস্তার এ মাথা থেকে রেলের পুল ছাড়িয়ে আরও প্রায় পোয়া মাইল দূর তক ! মেলা সবচেয়ে জমাট হয় মাঝামাঝি স্থানে, সেখানে ওদিকে আছে রাস্তা থেকে খাল পর্যন্ত অনেকটা ফাঁকা জায়গা, আর এদিকে আছে পাশের রাস্তাটার ফাঁপোলো মোড়। ফাঁকা জায়গায় থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর সার্কাস, মজার খেলা ও নাচগানের তাঁবু। লোক গিজগিজ করে এখানে।

রাস্তা আর খালের মধ্যে টিন-ছাওয়া ছোটো বড়ো গোলা ও আড়ত, মাঝে মাঝে দু-একটি জরাজীর্ণ পুরানো দালান। এখানে যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে, ভাঁটার সময় খালের কাদা ঠেলে সালতি ছাড়া ছোটো নৌকা চলতে না পারলেও এও বন্দরতুল্য, দেখে তা মনে হয় না—ঠাকুরদাদার জীবদ্দশার শৈথিল্য যেন শুধু মরচে পড়ে মরছে এখানে, আর কিছু নয় ! এ পাশের দোকান ও বাড়িঘরগুলি অনেক উন্নত, যেহেতু আধুনিক।

লড়াইয়ের আঁধার বছরগুলিতে মেলা জমেনি। আলো না জ্বালাতে পারলে কি মেলা জমে, দিনে দিনে পাততাড়ি গুটোতে হলে। এ বছর শুধু ওই সাঁঝের বাতি না জ্বালাবার হুকুমটা বাতিল হতেই মেলা জীবন্ত হয়েছে আশ্চর্য রকম। সবাই যেন হাঁ করে অপেক্ষা করছিল লড়াই শেষ হবার জন্য যতটা নয়, লড়াই শেষ হলে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মেলা করার জন্য। গায়ে গায়ে ঘেঁষে দোকান বসেছে তিন পো মাইল রাস্তার যেখানে ঠাঁই মিলেছে সেখানে, ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের একহাত চওড়া রোয়াকটুকু পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে। চৌকি পেতে, কাঠের তক্তায় কিংবা স্রেফ বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বেঁধে, চাঁচের বেড়া ও হোগলার চালা তুলে হয়েছে কোনো দোকান, কারও ছাউনি একখানি কুড়িয়ে আনার মতো মরচে পড়া ঢেউ টিনের, কারও দুখানা রিজেক্ট পিপে কেটেকুটে হাতুড়ি পিটে সোজা করা ছাদ, কারও খোলা আকাশের নীচে ড্যাম রোদবিষ্টি ড্যাম ফ্যাশনের দোকান—যেন পটারি কারখানার নল-ভাঙা কেটলি, চটলা-ওঠা হাতলহীন কাপ ইত্যাদির দোকান—দোকানটাই যেন ঘোষণা যে বড়োলোক বাবুদের জিনিস, একটু খুঁতওলা জিনিস, তাতে আর কী হয়েছে, এখানে কিনতে পাবে এমন সস্তায় তোমার পয়সায় কুলোয়, এ সুযোগ ছেড়.না, টিনের মগে চা না খেয়ে বাবুরা যে কাপে খান সেই কাপে, শুধু একটু চটলা-ওঠা হাতলহীন কাপে, চা খাও ! আর সত্যি কথা, কাপ কেটলির দোকানে কী ভীড় মেয়েপুরুষের, চা খাওয়া যাদের ন মাসে ছ মাসে সর্দি-কাশির ওষুধ হিসেবে, বিয়োনি মেয়ের ব্যথার জোর বাড়িয়ে তাকে রেহাই দেবার টোটকা হিসাবে।

খাদু বলে, মেলা নাকি ? মেলা ? মেলায় তো যামু তবে আইজ !

দত্তগিন্নির গা জ্বলে যায় শুনে,—প্রায় দেড়বছর কাজ করছে যে মন-মরা খাটুনে ভালো ঝিটা হঠাৎ মেলার নাম শুনেই তাকে আহ্লাদে উল্লাসে ডগমগিয়ে উঠতে দেখে।

মুখ ভার করে বলে, খাদু, কী করে মেলায় যাবি আজ ? আমার শরীর ভালো না। উনি আজ একটায় আসবেন, খেয়ে দেয়ে উঠে আমায় একটু না পেলে, খোকা গোলমাল করলে—

দত্তগিন্নি হেসে ফেলে, বুঝছিস তো খাদু ? হপ্তায় একটা দিন দুকুরের ছুটি, তাও আধখানা। খোকা কাঁদাকাটা করলে বড্ড রাগেন। উনি বিকেলে বেরোবার আগে তো মেলায় তোর যাওয়া হয় না।

অ মা ! খাদু বলে অবাক হয়ে, তা ক্যান যামু ? বেলা না পড়লে নি কেউ মেলায় যায় !

মেলায় যাবার নামেই যেন বদলে গেছে খাদু। দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই শহরে বাবুদের বাড়ি ঝিগিরিতে। কোথায় দেশ গাঁ আপনজন, জানাচেনা অবস্থায় অভ্যাসের ধাঁচে দিন কাটানোর সুখ আর কোথায় এই বিদেশে খাপছাড়া না-বনা মানুষের ঘরে দাসীপনা, এই দুঃখে সে একেবারে মিইয়ে ছিল। আজ যেন ডাক দিয়েছে আগের জীবন, ছেলেমানুষি ফুর্তি আর উত্তেজনা জেগেছে। চুলে ভালো করে তেল মেখে স্নান করে খাদু। দত্তগিন্নির সাবানটা এক ফাঁকে মুখে হাতে ঘষে নেয় একটু। টিনের ছোটো তোরঙ্গে তোলা সাফ থানটি বার করে রাখে। শেমিজটা বড়ো ময়লা হয়েছিল, স্নানের আগেই সাবান দিয়ে সাফ করে রেখেছে।

একটা কথা ভেবে খাদু একটু দমে যায়। এই ঘটির দেশের মেলা না জানি কেমন হবে ! খোকাকে কোলে নিয়ে গিন্নিমার পিছু পিছু এক্‌জিবিশনে ঘুরে এসেছে সেদিন, সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলে চোখ ঝলসানো কাণ্ড বটে সেটা, থ বানিয়ে দেয় মানুষকে, কিন্তু মেলার মজা নেই একফোঁটা, প্রাণ ভরে না ঘুরে ঘুরে। ওমনি এক্‌জিবিশনকে এ দেশে মেলা বলে কিনা কে জানে !

বাবু বেরিয়ে যেতে না যেতে শেমিজ কাপড় পরে খাদু বলে, যাই মা ?

দত্তগিন্নি মুখ ভার করে বলে, যাবার জন্য তরপাচ্ছিস দেখি ! যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি, দেরি করিসনে।

কংক্রিটের পুলটার নীচে মেলার এ মাথায় পৌঁছে খুশিতে হাসি ফোটে খাদুর ঠোঁটের ফাঁকে মিশিঘষা কালো মজবুত দাঁতে। এ মেলা মেলাই। গরিব গেঁয়ো মেয়ে-পুরুষের ভিড়, রঙিন কাগজের ঘূর্ণি, ফুল, বাঁশের বাঁশির ফেরিওলা, মাটির ডুগডুগি, বেহালা, পুতুল, কাঠের খেলনা, তেলেভাজার দোকান, হোগলার নীচে মাটিতেই যা কিছু হোক বিছিয়ে পসরা সাজানো—সব আছে ! পুলকে কেমন করে ওঠে মনটা খাদুর। হায় গো, কেউ যদি একজন সাথি থাকত তার।

পায়ে পায়ে এগোয় খাদু এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে থেমে থেমে ঘুরে ঘুরে পিছু ফিরে এপাশ ওপাশ গিয়ে গিয়ে। কিনবার জন্য, যা কিছু হোক কিনবার জন্য, মনটা তার নিশপিশ করে। পিঠে সে অনুভব করে আঁচলে-বাঁধা কাঁচা একটা টাকা আর খুচরো এগারো আনার চাপ। কোমরের আঁচলের কোণেও বাঁধা আছে একটাকার চারটে নোট। জীবনে আর কখনও কোনো মেলায় খাদু এত টাকা পয়সা নিয়ে যায়নি, তাও আবার সব তার নিজের রোজগারের টাকা পয়সা। বাপ ভায়ের কাছে চেয়েচিন্তে, একরকম ভিক্ষে করে কয়েক গণ্ডা পয়সা নিয়ে সে মেলায় যেত, আজ এসেছে নিজের কামানো পাঁচ টাকা এগারো আনা নিয়ে ! টাকা থাকার মজাটা যেন খেয়ালও করেনি খাদু এতদিন, আজ যেন তার প্রথম মনে পড়ে যে দত্তগিন্নির কাছে তার দেড়-দু বছরের মাইনের অনেক টাকা জমা আছে, দু-এক টাকার বেশি কোনো মাসেই সে নেয়নি। সে কত টাকা হবে কে জানে ! টাকার জোরে বুকের জোর যেন বেড়ে যায় খাদুর আজ মেলায় এসে নিজের পয়সা যেমন খুশি খরচ করতে পারবে খেয়াল হওয়ায়।

সেই সঙ্গে এতদিন পরে একটা ভয় ঢোকে খাদুর মনে। এতকালের মাইনের টাকাগুলি জমা রেখেছে দত্তগিন্নির কাছে, হিসেবও জানে না সে কত টাকা হবে, দত্তগিন্নি যদি তাকে ফাঁকি দেয়, যদি একেবারে নাই দেয় টাকা ? বোকার মতো কাজ করেছে, খাদু ভাবে। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নিজের কাছে টিনের তোরঙ্গে রাখেনি বলে আপশোশ করে খাদু। হায় গো, টাকাগুলি যদি মারা যায় তার !

কী কিনবে ভাবতে ভাবতে সোনার একটা আংটি কিনে বসে খাদু বারো আনা দিয়ে। খাঁটি সোনা নয় কিন্তু ঠিক যেন সোনা, কী সুন্দর যে মানিয়েছে তার বাঁ হাতের সেজো আঙুলে। বিয়েতে একটা আসল সোনার আংটি পেয়েছিল খাদু, বছর না ঘুরতে সে আংটি কেড়ে নিয়েছিল বরটা তার, ফিরে দেবে বলেছিল বটে কিন্তু আরও যে বছরখানেক বেঁচেছিল তার মধ্যে দেয়নি। ও মিছে কথা, বেঁচে থাকলেও দিত না, খাদু জানে। তারপর কতকাল আংটি পরার শখটা খাদু চেপে রেখেছিল, এতদিনে মিটল। কিন্তু না গো, মিটেও যেন মিটল না, প্রথম বয়সের সাধ কি আর মেটে মাঝ বয়সে, নিজে নিজের সাধ মেটালে, কেউ আদর করে কিনে না দিলে।

বজ্জাতেরা তাকায়, গায়ে গা ঘষে যায় ছলে কৌশলে, খানিক আগে থেকেই পিছু নিয়েছে ওই বাবুসাজা লোকটা। ফিনফিনে পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জিটা যেমন স্পষ্ট, ওর মতলবও স্পষ্ট তেমনি। খাদু ওসব গায়ে মাখে না, রাগ করে না, বিচলিত হয় না। মেলাতে এ রকম হয়, কতকগুলি লোক এই করতেই আসে মেলায়, মেয়েলোকের গায়ে একটু গা ঠেকিয়ে মজা পেতে, পুরুষ হয়ে চোরের মতো এইটুকু নিয়ে বর্তে যায়, কী ঘেন্না মাগো। আসল বজ্জাত ওই লোকটা যে পিছু নিয়েছে একলা মেয়েলোক দেখে, গুন্ডা না হলে কেউ কখনও দারোয়ান গাড়োয়ানের চেহারা নিয়ে বাবু সাজে। নিক পিছু, ঘুরুক সঙ্গে সঙ্গে। বোকা হাবা মেয়ে ভেবেছে খাদুকে, টের পাবে ভাব করতে এলে, এই ভিড়ের মাঝে খাদু যখন গলা ছেড়ে শুরু করবে গাল দিয়ে ওর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে।

পড়ন্ত রোদের মতো তেজ কমে কমে আসে খাদুর আনন্দ ও উত্তেজনার, নিভে যেতে থাকে উন্মাদনা। একা আর কতক্ষণ ভালো লাগে মেলা, কথা কওয়ার কেউ একজন সাথে নেই।

খিদে পায়। এতলোকের মাঝে খেতে লজ্জা করে খাদুর। ভাজা পাঁপড় কিনে আঁচলের তলে লুকিয়ে ফেলে বাঁ হাতে, ডান হাতে এক এক টুকরো ভেঙে নিয়ে এমন ভাবে মুখে দিয়ে চিবোয় যে কেউ টেরও পাবে না পানসুপারি মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে না কিছু খাচ্ছে। এমন সময় কাণ্ড দ্যাখো কপালের, খাদু সোজাসুজি সামনে পড়ে যায় দত্তবাবুর।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে দত্তবাবু উদাসীনের মতো এগিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আস্তে আস্তে থামে, ফিরে কাছে গিয়ে বলে, মেলা দেখতে এয়েছিস ?

যেন মেলাতে মেলা দেখতে আসেনি খাদু, এসেছে ঘাস কাটতে। তিরিশের ওপরে বয়স হবে দত্তবাবুর, বিয়ের চার বছর পরে জন্মেছে খোকাটি, খোকার তিনবারের জন্মদিন বলে ক মাস আগে খাওয়াদাওয়া হল বাড়িতে। টুকটুকে ফরসা রঙের না-মোটা না-রোগা সুন্দর চেহারা দত্তবাবুর, মুখখানা ফ্যাকাশে, চুপসানো। দেখে এমন মায়া হয় খাদুর। গিন্নিমা শুষে শুষে শেষ করে দিয়েছে বাবুকে, টাকার জন্য আপিসে খাটিয়ে আর বাড়িতে নিজের রাক্ষুসি হিড়িম্বার খিদে মিটিয়ে। আড়ি পেতে সব শুনেছে সব জেনেছে খাদু। বউ-বর খেলো দেলো শুতে গেল মিলল মিশল ঘুমাল, এই তো নিয়ম জানে খাদু, গিন্নিমা যেন মাগি মাকড়সার মতো তাতে খুশি নয়, রাত বারোটায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসাদে মরোমরো বরটাকে যে করে হোক জাগিয়ে তুলে খাবেই খাবে, বেশি যদি নেতিয়ে পড়ে তো ঝাঁঝিয়ে বলবে, মেয়ে বন্ধু তো গাদা গাদা, কার সাথে কারবার করে এলে আজ যে বিয়ে করা বউকে এত অবহেলা ?

আড়ি পেতে বাবুর কাতরতা দেখতে দেখতে যেন একশো বিছে কামড়েছে খাদুকে, চিৎকার করে বলতে সাধ গেছে, লাথি মেরে রাক্ষুসিকে বার করে দিয়ে ঘুমো না, কেমন ধারা পুরুষ তুই।

এই ক আনা পয়সা নে, কিছু কিনিস, দত্তবাবু বলে খানিকটা কাচুমাচু ভাবে, আর শোন খাদু, বাড়িতে যেন বলিস না আমায় মেলায় দেখেছিস।

পয়সা পেয়ে খাদু মুচকে হেসে মাথা নাড়ে। দত্তবাবু এগিয়ে গেলে পিছু থেকে জিভের ডগাটুকু বার করে তাকে অবজ্ঞার ভেংচি কাটে। এমনও পুরুষ হয়, বউয়ের ভয়ে মনখুশিতে মেলায় আসতে ডরায় !

মেলার মাঝখানে জমজমাট অংশে আটকে যায় খাদু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এইখানেই। মোড়ের মাথায় মন্দিরের বদলে একটা চ্যাপটা ঘরের মধ্যে সিঁদুরলেপা দাঁত-খিঁচানো ভীষণাকৃতি দানবরূপী প্রকাণ্ড দেবতা, খাদু ভক্তি ভরে প্রণাম করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পুতুল নাচ দ্যাখে, রামায়ণ মহাভারতের রাজা রানিদের চেয়ে দেখে তার মজা লাগে শণের দাড়িওলা মুনিগুলো আর হনুমানকে। নুলো খঞ্জ অন্ধ ভিখারিদের দিকে না তাকিয়ে সে দুটি পয়সা দেয় জোয়ান মর্দ ভিখারিকে, কেঁদে কেঁদে ভগবান ভালো করবেন বলার বদলে সে হেড়ে গলায় সবাইকে শাসিয়ে ভিক্ষা চাইছে, তাকে না দিলে তুমি মরবে, তোমার সর্বনাশ হবে। অনেক কিছু কেনার এত সাধ নিয়েও ওই আংটি আর একটি আরশি ছাড়া আর কিছুই কেনা হয়নি খাদুর, কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়েছে, কার জন্য কিনবে, তার কে আছে, কী কাজে লাগবে তার জিনিসটা, তার ঘর নেই, সংসার নেই, সাজাগোজা নেই, আরামবিরাম নেই। কী করতে সে মেলায় এলো, কী সুখটা তার হল মেলায় এসে। আপন মনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে কী ভালো লাগে মেলায়। এত লোকের হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনটাতে ব্যস্ততা এনে শুধু খাঁখাঁ করানো।

মেয়েছেলেরাও উঠেছে নাগরদোলায়, দুজন চারজনে একসঙ্গে, নয়তো পুরুষ সাথির সঙ্গে, লজ্জা শরম ভুলে আওয়াজ ছাড়ছে অদ্ভুত, দিশেহারা হয়ে আঁকড়ে ধরেছে সাথিকে, খিলখিলিয়ে হাসছে যেন ভূতে পাওয়ার হাসি। একসঙ্গে ওই ভয় আর ফূর্তি, ওপরে উঠে নীচে নেমে দোল খাওয়ার ওই বিষম মজা আর তীব্র সুখের শিহরন যে কেমন খাদু কি আর জানে না। সাথি কেউ থাকলে সেও একটু নাগরদোলায় চাপত, অনেকদিন পরে আবার একটু চেখে দেখত কেমন লাগে নিজের ভেতরে ওই শিরশির করা।

কী ভাব ?

মাঝখানে কোথায় সরে গিয়েছিল, আবার পিছু নিয়েছিল লোকটা পুতুল নাচ দেখবার সময়, এখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ঝেঁঝে উঠত খাদু সন্দেহ নেই ; ফোঁস করে উঠে এক নিমিষে টের পাইয়ে দিত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিষ দাঁতে সে ছোবল দেবে। কিন্তু কথা হল কি, লোকটার কথায় তার দেশি টান। দেশ গাঁয়ের চেনাজানা কেউ যেন ছদ্মবেশে তাকে এতক্ষণ ঠকিয়ে এবার নিজেকে জানান দিল কথা কয়ে। তাই শুধু মুখটা গোমড়া করে বলতে হয় খাদুকে, কী ভাবুম ?

দেইখাই চিনছি দেশের মানুষ তুমি।

চিনছ তো চিনছ।

পাতলা পাঞ্জাবির নীচে শুধু গেঞ্জি নয়, গেঞ্জি আঁটা চওড়া মোটা শক্ত বুক আর কাঁধ আছে, ঘনকালো কিছু লোম দেখা যায় গেঞ্জির ওপরে। জবরদস্ত গর্দান লোকটার। মুখের চামড়া খেতমজুরের মতো পুরু আর কর্কশ। দু-এক নজরে দেখে নিয়ে খাদু আবার ভাবে আপশোশের সঙ্গে, চাষাভুসোর এমনধারা বেমানান বাবু সাজা কেন ?

দোলায় চাপবা ?

না।

ডর নাই, আমারে কোনো ডর নাই তোমার। লোকটা বলে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে, পুবের আকাশের যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাশে করে রেখেছে সন্ধ্যাকে সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বিড়ি ধরায়। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার পকেটে রেখে বিড়িটা বার করে।

তোমারে ভাবছিলাম বাবুগো মাইয়া বুঝি, কথা কইবার চাইয়া ডরাইছি। তবু মনডা কইল কি, না, বাবুগো ঘরের মাইয়ালোক সাহস পাইব কই যে একা আসব মেলায় ? কথা কমু ভাবি, ডরাই। শ্যাষে অখনে কইলাম। ডর নাই, আমারে ডর নাই।

ডরে তো মরি। লোকটার কথা শুনে বিষম খটকা লাগে খাদুর মনে। সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মতো খাপছাড়া আর হাস্যকর, চাষাভুসো ঘরের মেয়ে হয়ে বাবুর ঘরের রাঁড়ির বেশ ধরে ? ছোটো একটা তাঁবুতে পরির নাচ অর ম্যাজিক দ্যাখাচ্ছে। নাচের নমুনা ধরা হয়েছে সবার সামনে। রোগা-ক্যাংটা কালো কুৎসিত তিনটি মেয়ে মুখ গলা হাতে পুরু করে রং লেপে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাঁবুর সামনে ছোটো বাঁশের মঞ্চে ভঙ্গি করছে নাচের, গলা ছেড়ে পাঁচমেশালি সুরে গান ধরেছে ভাঙা হারমনিয়ামের সঙ্গে,—একজন ওদের মধ্যে হিজরে। মাঝে মাঝে তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শুধু এরা নয় আরও অপ্সরা আছেন ভেতরে, দু আনা চার আনায় ওই পরিদের মজাদার নাচ দেখার সুযোগ ছেড়ো না, তার সঙ্গে ম্যাজিক, ভাঁড়ামি ! চলা আও, চলা আও—দো দো আনা, চার চার আনা।

আমার পয়সা আমি দিমু কইলাম। গায়েপড়া ঝগড়ার সুরে খাদু বলে দুআনা পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে। নাচ দেখতে তাদের মধ্যে ভেতরে যাবার কথাও হয়নি তখন পর্যন্ত, তার হয়ে লোকটির টিকিটের পয়সা দেবার কথা দূরে থাক।

দিয়ো, তুমিই পয়সা দিয়ো। লোকটি বলে আমোদ পেয়ে, কিন্তু অ্যানে কী দেখবা ? খালি ফাঁকিবাজি, ঠকাইয়া পয়সা নেওনের ফিকির। দেখবা যদি, চীনাগো সার্কাস দেখি গা চল। খাসা দেখায়, পয়সা দিয়া খুশি হইবা।

দেখি না কী আছে।

সব দেখবে খাদু এবার, ভালোমন্দ যা কিছু দেখার আছে ; এত মানুষ ঠকছে সাধ করে সেও নয় ঠকবে, বিশ্বাসী সাথি যখন পেয়েছে একজন। বিশ্বাস রাখবে কিনা শেষ পর্যন্ত ভগবান জানে, কী বিপদ আজ তার অদেষ্টে আছে তাও জানে ওই পোড়ারমুখো ভগবান, তবে মেলায় কোনোরকম নষ্টামি গুন্ডামি যে করবে না লোকটা এটুকু খাদু জানে। বুঝদার বিশ্বাসী সাথির মতোই সে সাথে থাকবে, মনখোলা আলাপি কথায় হাসি তামাশায় খুশি থাকবে দুজনেই, ভালো লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাকবে ওর চাপা পড়া।

ঘেন্না জন্মে যায় সস্তা নাচ, বাজে ম্যাজিক, বগলে লাঠি খুঁচিয়ে কাতুকুতু দেওয়ার মতো ভাঁড়ামি দেখে। তবু শেষ পর্যন্ত থাকে খাদু, উপভোগও করে। এও মেলারই অঙ্গ। জেনেশুনে কত বাজে জিনিস কেনে লোকে পয়সা দিয়ে, অন্য সময় যেভাবে পয়সা নষ্ট করার কথা ভাবলেও গা জ্বালা করত, নইলে আর মেলার উন্মাদনা কীসের। নিজের ভেতরে উথলাচ্ছে আনন্দ আর উত্তেজনা, তাই দিয়ে ফাঁকিকেও সার্থকতা দেওয়া যায়। মেলায় না হলে একটা পয়সা দিয়েও কি কেউ দেখতে চাইত এ সব।

বয়সের পাকামি আছে, সে যাবার নয়, তবে ছেলেবয়সের আবেগ পুলকের বন্যাও থইথই করছে মনে। ফাঁকি যাচাই করতে করতেও উৎসুক লোভী মন নিয়ে খুশি হয়েই খাদু দ্যাখে হিমালয় পারের অজগর সাপ, এক ছেলের দুই মাথা, জন্ম থেকে জোড়ালাগা দুই মেয়ে।

অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয় খাদু, ছেলে কাঁখে বউটির সঙ্গে, কুলো আর পাখা হাতে বিধবাটির সঙ্গে, একপাল বউ ছেলে নাতিনাতনি নিয়ে বেসামাল সধবা গিন্নিটির সঙ্গে। দেখা হয়

চেনা মানুষের সঙ্গে। সুবলের মা, পাড়ার তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। চুপিচুপি শুধোয় সুবলের মা, সাথে কে ?

দ্যাশের মানুষ, কুটুম। খাদু বলে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, নীচে অসংখ্য আলো জ্বলছে মেলার। এক্‌জিবিশনের চোখ ঝলসানো বাড়াবাড়ি আলো নয়, কাছে তেল মোম গ্যাসের শিখা, কোনোটা কাচের মধ্যে কোনোটা খোলা, তফাতে জ্যোৎস্নারাতের তারার মতো।

আরও দেখবা ?

দেখুম না, চীনা সার্কাস ? তুমিই তো কইলা।

চীনা সার্কাসের তাঁবুটা অনেক বড়ো। চার আনা আট আনা টিকিটের দাম। লোক টানবার জন্য সামনে খেলার নমুনা দেখানো হচ্ছে এখানেও, ভিন্ন রকম নমুনা। মেয়ে আছে তিনটি, দুজন হলদে রঙের চীনা, একজন কালো রঙের বাঙালি। কালো হলেও ছিরিছাঁদ আছে মেয়েটির, রং মেখে ভূতও সাজেনি, সস্তা ঢং-এর ভঙ্গিও নেই। চীনা মেয়ে দুটিকে বড়ো ছোটো বোন মনে হয় খাদুর। পিছু বেঁকে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে, হাতের ভরে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, ছোটো লোহার চাকার ভেতর দিয়ে কৌশলে গলে গিয়ে ওরা খেলার নমুনা দেখাচ্ছে ! আঁটোসাঁটো জোয়ান বয়সি চীনাটি দু হাতের সরু দুটি ছড়ির ডগায় বসানো প্লেট দুটিকে বনবন করে ঘোরাচ্ছে। আর একজন, তাকে ওর ভাই মনে হয় খাদুর, পাঁচ-ছটা লোহার শিকের আস্ত চাকা নিয়ে চাকার সঙ্গে চাকা আটকে আবার খুলে ফেলছে, কী করে কে জানে ! ভেতরে গিয়ে খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় খাদু। পাঁচ-ছ বছরের একটা ছেলে, সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে পাক খেয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বড়ো একজনের মাথায় হাতের ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে দিচ্ছে, এ সব দেখে রোমাঞ্চ হয় খাদুর। টেবিলে কাঠের গোলায় বসানো তক্তার দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি মেয়ের দোল খাওয়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেজো চীনা মেয়েটিকে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে টেবিল ডিঙোতে দেখে, আগুনের চাকার মাঝখান দিয়ে গলে যেতে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়, ভাবে কত কাল ধরে কী ধৈর্যের সঙ্গে তপস্যা করে না জানি এ সব কসরত আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে !

খাদু সবচেয়ে অভিভূত হয় ভেবে যে এক সংসারের বাপ-ছেলে মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে এমন চমৎকার সার্কাস দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দলের সবাইকে দেখার পর এতে আর তার সন্দেহের লেশটুকু নেই। চেহারার মিল নয় নাই ধরতে পারল সে ওদের, বয়স কখনও সবার খাপ খায় এমন ভাবে এক পরিবারের না হলে—বুড়ো একজন বাপ, মাঝবয়সি, জোয়ান, কিশোর আর ছেলেবয়সি এই চার ছেলে, তিন-চার বছর বয়সের ফারাকের দুটি জোয়ান আর ন-দশ বছরের একটি, এই তিন মেয়ে। মা বুঝি নেই ওদের। বউ বুঝি মরেছে বুড়ো বেচারার। আহা।

জোয়ান মেয়ে দুটির দুজনেই মেয়ে না একজন ছেলের বউ একজন মেয়ে কিংবা দুজনেই ছেলের বউ, এই একটু খটকা থাকে খাদুর। সিঁদুরও দেয় না যে আন্দাজ করে নেবে। কালো মেয়েটা এদের সঙ্গে কেন, সেও আর এক ধাঁধা খাদুর।

আমাগো মাইয়াটা কী করে চীনাগো লগে ? সে শুধোয় সঙ্গীকে।

ভাড়া করছে।

এরা নাকি সাধারণত হয় অল্প বয়সে চুরি করা অথবা অনাথা মেয়ে, সংসারে যাদের দেখবার শুনবার কেউ নেই। বড়ো হলে কাউকে দিয়ে করানো হয় দেহের ব্যাবসা, কেউ শেখে চুরিচামারির কায়দা, কেউ শেখে কসরত। এ মেয়েটা হয়তো ভাড়াও খাটছে, নতুন খেলাও শিখছে চীনাদের কাছে, পরে আরও দাম বাড়বে। অবাক হয়ে শোনে খাদু। বিরাট এ জগৎ সংসার, অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সীমা নেই তাতে। কোথাকার এই বিদেশি পরিবার সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কোথায়

কার ঘরে জন্মে আজ ওদের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছে এই কালো মেয়েটা। এক দুর্বোধ্য বিস্ময়কর অনুভূতিতে বুকটা তার কেমন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সে ভাবে, মানুষ কী যে করে সংসারে আর কী যে করে না !

নাগরদোলার বুক-শিরশির-করা সুখটা তিন-চার পাকের বেশি সয় না খাদুর, কাতর হয়ে বলে, নামুম। থামান যায় না ?

যায় না ?

জোরে হাঁক দিয়ে নাগরদোলা থামাতে বলে লোকটি, যেন হুকুম দেয়। আর এমন আশ্চর্য, তার হুকুমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে আরম্ভ করে দোলা। পাশ থেকে উঠে লোকটি আগে নামতে গেলে খাদুর খেয়াল হয়, লজ্জাশরম ভুলে দুহাতে কীভাবে ওকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

ডর করে নাকি ?

না। খাদু জোর দিয়ে বলে, গা গুলায়।

মেলায় মানুষ কমতে শুরু করেছে। বিকালে মানুষের জোয়ার এসেছিল, তাতে ধরেছে ভাঁটার টান। মেলা আর ভালো লাগে না, শ্রান্তি বোধ করে খাদু। মেলায় ছড়ানো নিজেকে এবার গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। ফিরে গেলে ঘ্যানঘ্যান করবে দত্তগিন্নি, কৈফিয়ত চাইবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর দত্তবাবুর বুড়ি মায়ের ঘুপচি ঘরটির মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে শোয়া। সারারাত বুড়ি কাশবে, বারবার উঠবে। ভাবলেও মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় খাদুর।

কিন্তু বাড়ি সে যে যাবে, বিশ্রাম সে যে করবে, সে তো এতক্ষণের সাথিটি রেহাই দিলে তবেই ! এবার সময় হল ওর মতলব হাসিলের। বেশ ভালো করেই জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়েছে, এবার কোন ভয়ংকর স্থানে নিয়ে যাবে কে জানে, যা খুশি করবে তাকে নিয়ে, হয়তো ছেড়ে দেবে দলের খুনে গুন্ডাদের হাতে, হয়তো শেষরাতে গলাটা কেটে ফাঁক করে ভাসিয়ে দেবে খালে। বুকটা ঢিপঢিপ করে খাদুর। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা কিছুক্ষণ থেকে, বারবার চোখ বুলোচ্ছে তার পা থেকে মাথা অবধি। গায়ে কাঁটা দেয় খাদুর।

যাইগা অখন রাইত হইছে। সে বলে ভয়ে ভয়ে।

যাইবা ? রাইত হয় নাই বেশি। ক্ষুব্ধ চিন্তিতভাবে লোকটা খাদুর নতুন ভাবসাব লক্ষ করে, চলো যাই, দিয়া আসি তোমারে। কলাপাড়া নন্দ লেন কইলা না ?

আমি যাইতে পারুম। ক্ষীণস্বরে খাদু বলে।

পারবা না ক্যান ? বাড়িটা চিনা আসুম, বুঝলা না ?

বোঝে না ? সব বোঝে খাদু। চলুক সাথে, বড়ো রাস্তা ধরে সে যাবে, রাস্তায় এখন গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের ভিড়। পাড়ায় গিয়ে নির্জন গলিতে ঢুকবে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তার ভয়টা কী, লোকজন জেগেই আছে সব বাড়িতে এখন।

কী কিনা দিমু কও।

তিন্যটি না।

তোমার খালি না আর না। লোকটা বলে বেজার হয়ে।

কংক্রিটের পুলের গোড়ায় বড়ো রাস্তার পাড়ে লোকটা রিকশা ডেকে বসে একটা, খাদুকে চমকে আর ভড়কে দিয়ে।

না না, রিকশা লাগব না।

লাগব। ধমকে দিয়ে বলে এবার লোকটা, সব কথায় না না করো ক্যান ? উইঠা বস রিকশায়, কও তো হাঁইটা যামু নে আমি লগে।

খাদু কিছু বলে না, কী আর বলবে। লোকটা তার পাশে উঠে বসে। আংটিপরা হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেয় ধমক দেবার দোষ কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে। ঘেমে জল হয়ে গেছে খাদুর গা তখন, হাত-পা যেন অবশ হয়ে এসেছে।

রিকশা চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ বলে রিকশাওয়ালাকে, ডাইনে যাও।

না না, বড়ো রাস্তায় চলুক।

এইটা রাস্তা না ?

রিকশা ঢোকে ডাইনের রাস্তায়। এটা সোজা পথ কলাপাড়া যাবার খাদু জানে, কিন্তু বড়ো রাস্তা ছেড়ে রিকশা যখন ঢুকেছে এই গলিতে তখনই খাদু জেনেছে কলাপাড়ায় নন্দ লেনে দত্তবাড়িতে আর সে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। দুপাশে ঘিঞ্জি বস্তি, টিন আর খোলার চালে জ্যোৎস্না, সরু সরু গলিতে অন্ধকার। ওর মধ্যে কোথায় যেন জোরালো হল্লা চলেছে, মেয়েমানুষ গানও গাচ্ছে হারমনিয়ামের সঙ্গে ! এর মধ্যে নিয়ে যাবে কি লোকটা তাকে ? এ অঞ্চল পেরিয়ে রিকশা রাস্তায় বাঁক ঘুরলে খাদু একটু স্বস্তি পায়। এ অঞ্চলটা শান্ত, দুপাশে কাঁচা পাকা বাড়িতে গেরস্থ, আধা-গেরস্তের বাস।

কিন্তু খানিক এগিয়েই লোকটা থামতে বলে রিকশাওয়ালাকে। ঘনিষ্ঠ সুরে বলে, আমার ঘরখান চিনাইয়া দেই তোমারে, কী কও ?

পুরানো একটা পাকা গ্যারেজ ঘর, দরজা এখন তালাবন্ধ। এখানে সে থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়, ঘুমোয়। পাশে গায়ে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনে দোকানের মতো মস্ত দুপাট কপাট, ওপরে নীচে দুটো তালা সাঁটা। ওপরে একটা তেরাবাঁকা সাইনবোর্ড, দুপাশে সাইকেলের দুটো পুরানো টায়ার ঝুলছে। এটা তার সাইকেল মেরামতি দোকান—দামোদর সাইকেল ওয়ার্কস !

নাম কই নাই তোমারে ? আমার নাম দামোদর।

রিকশার জোয়াল নামিয়ে রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামবার অপেক্ষায়। শক্ত করে পাশটা চেপে ধরে ঝোঁক ঠেকিয়ে খাদু কাঠ হয়ে বসে থাকে।

নামবা না ?

না। তুমি নাম।

চাঁদের আলোয় পথের আলোয় বেশ দেখা যায় মুখে যেন তপ্ত রাগের ছ্যাঁকা লেগেছে দামোদরের। একহাতে সে খাদুব আংটিপরা হাতের কবজি চেপে ধরে, এত জোরে ধরে যেন খেয়াল নেই ওটা মেয়েছেলের নরম হাত, হাড় ভেঙে যেতে পারে মট করে, আর এক হাতে সে মুঠো করে ধরে খাদুর বুকের কাপড় শেমিজ।

মার। আমারে মাইরা ফেলাও। খাদু কেঁদে ফেলে হুস করে, জোরে নয়, চেপেচুপে, ক হাত দূরে রিকশাওয়ালাও টের পায় কি না পায় ! আগে থেকে সে যেন তৈরি হয়েই ছিল এমনিভাবে কাঁদবার জন্য।

দামোদর ভড়কে গিয়ে বুকের কাপড় হাতের কবজি ছেড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ, থ বনে গিয়ে গুম হয়ে থাকে কয়েক লহমা। তারপর রিকশাওয়ালাকে চলতে বলে কলাপাড়ার দিকে।

রিকশাওয়ালা চলতে আরম্ভ করলে খাদুকে বলে, ব্যারামস্যারাম নি আছে মাথার ?

সে রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তায় পড়ে রিকশা, আবার ইটের রাস্তায় বাঁক নেয় শহরতলির শান্ত নিঝুম উঠতি ভদ্রপাড়ার এলাকায়। মাঠ, পুকুর বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো নতুন বাড়ি, ছোটো সীমায় ঠাসা গরিবের পুরানো বস্তি। শরীর জুড়ানো হাওয়া বইছে অবাধে, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক,

কোনো বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে-আসা বাঁশির বাবুয়ানি মিহি সুর। আকাশে মুখ তুলে চাঁদ দেখতে হয় না, চারদিকে চাঁদেরই আলো চোখের সামনে ছড়ানো।

নন্দ লেনের মোড়ে ঘন তেঁতুলগাছের ছায়া। খাদু দাঁড়াতে বলে রিকশাওয়ালাকে। তোমার লগে দেখলে বাড়ির লোক কী কইবো ? আমি নামি।

নাম।

খাদু রিকশায় বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দত্তবাবুর বাড়ির হদিস তাকে বাতলে দেয়, বলে, ডাইনা দিকে তিনখান বাড়ির পরের বাড়িখান, দোতালা বাড়ি। দেইখাই চিনবা।

বাড়ি চিনতে হাঙ্গামা কি। দামোদর বলে উদাস গলায়, নন্দ লেনে দত্তবাবুর বাড়ি খুঁইজা নিতে পারতাম না ?

ফুরফুরে হাওয়ায় তেঁতুলগাছের ছায়া ঘেঁষে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে খাদু যেন চোখের সামনে দেখতে পায় দত্তবাড়ির অন্তঃপুর, খোকার কান্নায় স্বামীর পাশে শুতে দেরি হচ্ছে বলে রেগে গজর গজর করে শাপছে তাকে, মাছের মতো মরা চোখে চেয়ে দেখছে ঘুমকাতুরে গাল-চুপসানো দত্তবাবু, নীচের ঘরে চৌকিতে কাঁথার বিছানায় বসে দত্তবাবুর বুড়ি মা কেশে চলেছে খকখক করে আর মেজেতে শুয়ে খাদু ঝি এপাশ ওপাশ করছে অজানা কষ্টে। আজ রাতে কবজিটা টনটন করবে।

হাতটা মুচরাইয়া দিছ একেবারে, ব্যথা জানায়। আহত কবজি তুলে ধরে খাদু তাতে অন্য হাতের তালু ঘষে আস্তে আস্তে।

ষাইট, সোনা ষাইট। দামোদর বলে ব্যঙ্গ করে, কবিরাজি ত্যাল আইনা লাগাইও, মাথায়ও মাইখো ঘইষা ঘইষা।

লোক আসতে দেখে খাদু তেঁতুলগাছের ছায়ায় পিছিয়ে যায়। রিকশা আর গাছের ছায়ায় তার আবছা মূর্তির দিকে চাইতে চাইতে মানুষটা চলে গেলে এগিয়ে আসে। রিকশাওয়ালা তখন জোয়াল তুলে ধরেছে রিকশার।

আসি গো ঠাইরান। বলে খাদুর কাছে বিদায় নিয়ে দামোদর রিকশাওলাকে বলে, যাও জোরসে চলো। বখশিস দিমু।

খাদু বলে, শোনো, শুনছ ? একটা কথা ভাবতেছিলাম।

রিকশা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয় দামোদর।

খাদু বলে, তুমি তো বাড়ি চিনা গেলা আমার। কই দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনলা আমারে, তোমার ঘর চিনা নিতে পারুম কিনা ভাবি।

কি করবা তবে ? দামোদর জিজ্ঞেস করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপিয়ে।

গিয়া দেইখা চিনা আসুম ? খাদু বলে প্রায় অস্ফুট স্বরে। দামোদর স্পষ্ট শুনতে পায় প্রত্যেকটি কথা। রাসপূর্ণিমার বিনিদ্র উতলা রাত্রি হলেও সেখানে তাদের আশে পাশে আর তো কোনো শব্দ ছিল না।

মাসিপিসি

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারী আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড়ো সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সি, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আর একটা সালতি, দুহাত চওড়া হয় কি না হয়। দু মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সি একটি বউ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটোসাটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি ক-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়। আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পিছন থেকে পিসি বলে, অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।

মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দুমাথায় থাকলে বলা সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয় ? এত বড়ো সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—

মাসি বলে, খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি ?

পিসি বলে, খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটটু—মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।

মাসি বলে, চায়ের দোকান না কীসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী ?

পিসি বলে, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারোমাস সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু ?

কৈলাশ ফাঁপড়ে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাইতে নিতে আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দাও মেয়াকে।

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে ? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে ? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিনভোর রাতভোর ?

পিসি বলে, লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে ? না মরতে ?

গভ্‌ভোপাত ? কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, ফের গভ্‌ভোপাত ? সত্যি নাকি মাসি ? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি ?

মাসি বলে, কীসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘন ঘন ওকে নিতে ? থাকেনি দুদিন চারদিন করে ?

পিসি বলে, মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে ? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস ?

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন ? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।

পিসি বলে, না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা ছল-ছল চোখে এক একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোটো অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোরজবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোটো, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বউ নেওয়ার জন্যে। তার বিয়ে করা বউকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বউকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজ কালের মধ্যে। মরবে তোমরা জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদী একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে ?

বলে, মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তর-তর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আর একটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কি তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারির একটা রোগে, কলেরায়, সে তার বউ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত—ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরোমরো মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিকে সামলাবে ? মাসিপিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্যে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই।

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, একটা কাজ করবি বেয়াইন ? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারও সাথে হয়তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে কেই বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়া মাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার

ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেটভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনও মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায় ?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাসনি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ও সব কথা বলায় মোদের ?

পিসি বলে, দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ও সব কিছু বলিনি কৈলেশকে !

মাসি বলে, চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা ! মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।

পিসি বলে, ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপিচুপি এনে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে বসতে বলি তো বসে, রাত দুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মতো দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেল।

মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।

পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাসনি, ডর কীসের ?

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচরা, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার

চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন ?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত ওটা করা উচিত নয় এ সব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসিপিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে সেও যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন এল চৌকিদার কানাই ! হাঙ্গামা না করতে ও আসে না রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাই-এর সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।

মাসি বলে, এত রাতে ?

পিসি বলে, মরণ নেই ?

কানাই বলে, দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা ! বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, মোদের একজন গেলে হবে না কানাই ?

পিসি বলে, আমি যাই চল ?

কত্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসিপিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।

পিসি বলে, সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, এক দণ্ড লাগবে না।

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।

পিসি বলে, এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই ?

কানাই ফুঁসে ওঠে, না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, বটে ? ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।

পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না ? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।

দু পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো একটাকে মাবব জখম করব ঠিক।

পিসি বলে, মোরা নয় মরব।

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর ! ও ঘোষ মশায় ! ও জনাদ্দন ! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি ?

পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজন।

মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা।

পিসি বলে, তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুপিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।

আস্তে চুপিচুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গোরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় ছাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসিপিসি।

অমানুষিক

সে ছিল ও রকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকিপেটার বেশি না খেয়ে, কখনও বা দু-চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মতো সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুব্জার রুপোর পইছেটো দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়ল সকলের শেষে,—মাকড়ি আগে যাবে না ভিটে আগে যাবে এই নিয়ে মনান্তর হয়েছিল কুব্জার সঙ্গে ছিদামের। সবই যে যাবে, তখন একরকম স্থির নিশ্চয়ভাবে জেনে গিয়েছে ছিদাম, ছেলেটাও তার তখন মরে গেছে। তবু ঘরদুয়ারটা সে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অদৃষ্টে বিশ্বাস আর তার ছিল না, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস আর তার ছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে তবু এক দুর্লভ স্বপ্নের রং একটু সে মনে পুষে রেখেছিল যে মাথা গুঁজবার ঘরটা থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণটা তার যাবে না, আবার একদিন সব আসবে, জমিজমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুব্জার গয়না, কুব্জার গর্ভে সন্তান। ললিতবাবুর কাছে বাড়িটা বাঁধা দেবার পর তাই সে হতাশায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

একদিন ভোরবেলা বুড়ি মা, জোয়ান বউ আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে রওনা দিয়েছিল অন্য কোথাও কিছু করা যায় কিনা এই রকম একটা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। মরবে তো তারা সকলেই। সেও মরবে, বউ মরবে, মেয়েটাও মরবে, মাও মরবে। দেখা যাক বাঁচবার কোনো পথ যদি খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর কোথাও, যেখানে রোজ ইস্টিমার ভেড়ে, বড়ো বড়ো লোক থাকে বড়ো বড়ো দালানে, বড়ো বড়ো কারবার চলে বড়ো বড়ো আড়তে, রোজ দুবার বায়োস্কোপ দেখানো হয়, হাকিমরা বসবাস করে।

কিছুই সে প্রায় সঙ্গে নেয়নি। শুধু ছেঁড়া ধুতি আর পিরানের বান্ডিলটা, তার মধ্যে কলকে আর তিন পুরুষের তাবিজটা, তামার। বাহুতে আঁটা তাবিজটা খুলে সে বান্ডিলে ভরেছিল অবিশ্বাসে। ফেলে দিতেও পারত, তা দেয়নি। কোনো কিছু ফেলে দেবার স্বভাব তার নয়। তাছাড়া, গায়ে না রাখুক একেবারে ফেলে দিতে মনটাও খুঁতখুঁত করেছিল।

কুব্জা শুধিয়েছিল সসন্দেহে, যাও কই ?

আসি, দেইখা আসি। কিছু নি করন যায়।

কুব্জার মনে বুঝি খটকা লেগেছিল তার হাতের বান্ডিল আর ভাবসাব দেখে। গাঁয়ের আরও কত লোক এ রকম 'আসি' বলে চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ক্ষীণ আর্তসুরে সে বলেছিল, কই যাও কইয়া যাও, মরা মুখ দেখবা।

কমু অনে। ফির‍্যা আইসা কমু অনে।

হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল ছিদাম কথা আদানপ্রদানের সীমানা ছাড়িয়ে, পালিয়ে যাওয়ার মতো। হাপরের মতো ফুঁসতে শুরু করেছিল তার দুর্বল ফুসফুসটা ওইটুকু জোরে হেঁটে।

তারপর কতকাল কত পথ হেঁটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেওয়া পচা তরকারি মাছ ডিম কাড়াকাড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মূলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রের খিচুড়ি নিয়ে আর এক কেন্দ্রে

পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলো-কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।

কত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ছিদাম। দেখেছে শুনেছে সে অনেক কিছু, নিজেও করেছে অনেক কাণ্ড। তার মধ্যে গাবোকে বউ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুঃস্থ গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান। কাদের ক শো বছরের পুরানো দালানের এক পরিত্যক্ত অংশে কোলাকুলি দুটো দেওয়াল আর এপাশে ভাঙা ইটের স্তূপের মধ্যে তিনকোনা ছাদহীন শাপ-শেয়ালের বাসটিতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, গাছতলায় থাকলে পুলিশে জুলুম করে বলে, শীতে জমে যেতে হয় বলে। এখানে আকাশের হিম পড়ুক তার গায়ে, দুকোনা ভাঙা দেওয়াল দুটোতে উত্তুরে হাওয়া আটকাত, পুলিশ সামনের পথ দিয়ে গটমটিয়ে হেঁটে গেলেও লাঠির খোঁচা তাকে দিয়ে যাবার সুযোগ পেত না !

ওইখানেই গাবো এসে জুটেছিল একদিন না ডাকতেই। কুকুর বেড়াল তাড়ানোর মতো করে ছিদাম বলেছিল, যা যা, ভাগ।

গাবো তার পিছু নিয়েছিল নিশ্চয়, চট কাপড় কাঁথা মোড়া একটা পুরুষ পদ্মপাতার মস্ত এক খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাগের আশায়, লোভের বশে। খাবারের ঠোঙাটা সেদিন মরিয়া হয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল ছিদাম, আকাশের চিল যেমন মরিয়া হয়ে মানুষের হাতের খাবারের ঠোঙায় ছোঁ দেয়।

স্টিমার স্টেশন আর রেল স্টেশনের রাস্তা যে মোড়ে মিলেছে, যেখানে অনেকগুলি খাজা গজা রসগোল্লা পানতোয়ার দোকান আর মুরগি পাঁঠার মাংস ডিম কারিকোপ্তা ইলিশমাছের ঝোলের ভাতের হোটেল জাঁকিয়ে চলেছে, সেইখানে ভিক্ষা করছিল ছিদাম। তার সামনের দোকান থেকে বেঁটে রোগা নিকেলের চশমা পরা টাকওয়ালা এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক, যাকে দেখলে মনে হয় কোনো আড়তের খাতালেখা কর্মচারী, হাকিমের মতো জোর গলায় হুকুম দিয়ে খাবার কিনলে সাড়ে তিনটাকার, পরোটা এত, পানতোয়া এত, জিভে গজা এত, অমৃত এত। চেঙারিতে পদ্মপাতার ঠোঙায় সব খাবার নিয়ে সে যখন চলতে শুরু করল ইস্টিমার ও রেলস্টেশনের উলটো দিকের পথটাতে, ভিখারি ছিদাম এক নিমেষে হয়ে গেল ডাকাত, আকাশের ছোঁ-মারা চিল। সোজা গিয়ে ছোঁ মেরে ঠোঙাটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশ কাটাল পাশের মেয়ে-বস্তির সরু মোটা গলিঘুঁজির গোলোকধাঁধায়। সেখান থেকেই বোধ হয় গাবো তার পিছু নিয়েছিল। সরকারি মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো।

ধ্যাত্তেরি, ভাগ বলছি হারামজাদি কুত্তি !

গাবো ভাগেনি। ইটের স্তূপ ডিঙিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তার পায়ে একটা হাত দিয়ে, আর একটা হাত উঁচু করে ধরা খাবারের ঠোঙাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। জোড়াতালি লাগানো গায়ের ঢাকনিটা তার খসে গিয়েছিল। আকাশে কোন তিথির চাঁদ ছিল কে জানে। ছাদহীন পোড়োবাড়ির আশ্রয়ে ছালা কাপড়ের ঢাকনাহীন গাবোর দেহে এসে পড়েছিল মোটাসোটা চাঁদের তেরছা আলো। খাবারে কিন্তু গাবো বেশি ভাগ বসাতে পারেনি। কিছু খেয়েই সে গলা আটকে বলেছিল, জ-জ-জ জল—

জল খেয়েছিল একগাদা। খেয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, যেন মরে গেছে এমনি ভাবে !

বাচ্চাটাকে যোগাড় করেছিল গাবোই। বুঝিয়ে বলেছিল, শোন বলি। না না, এডা আমার পেটের না। কুড়াইয়া পাইছি, লইয়া আইছি আমাগো রোজগার বাড়ানের লেইগা।

চামড়া ঢাকা একরত্তি একটু প্রাণ, তেলফুরানো পিদিমের নিভু নিভু শিখার মতো, চামড়া ভরা ঘা।

রাতটা বাঁচবো ?

ক্যান বাঁচবো না ? গাবো গর্জে উঠেছিল ক্ষীণকণ্ঠে, মাই দিয়া দুধ পড়ে অখনো, দ্যাখো নাই ?

মাই টিপে দুধ বার করে আবার সে দেখিয়েছিল ছিদামকে। বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিয়েছিল মাই। সেই চামড়াঢাকা প্রাণটুকুর যে কোনো মায়ের স্তন্যপানের শক্তিশালী লীলাটা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ছিদাম। তারপর, আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য ইস্টিমারের একজন চাষাভুসো ধরনের যাত্রীর চটলা-ওঠা টিনের স্যুটকেস চুরি করে সে পোশাক সংগ্রহ করেছিল, ভদ্র চাষি গেরস্তের পোশাক।

দুখানা ঘরে-কাচা নহাতি মোটা শাড়িও সেই টিনের বাক্সে, খুশিতে গদগদ হয়ে গিয়েছিল গাবো।

অনেক আশা নিয়ে মাসখানেক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছে ছিদাম। গেরস্ত চাষিই সে ছিল ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা শুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষি সেজে। গাবোকে কুন্তারই মতো গেরস্ত চাষির বউ সাজিয়ে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মরোমরো বাচ্চাটাকে দিয়ে। কিন্তু বিশেষ কিছু তারতম্য হয়নি তাদের উপার্জনের। শহরের দালানের বড়ো বড়ো লোকেরা যেন খেয়ালও করতে চায়নি সন্তান-যুক্ত গেরস্ত চাষি পরিবার ভিক্ষা চাইছে না ছালা জড়ানো ঘেয়ো কুষ্ঠরোগী ভিক্ষা চাইছে, ভিক্ষাই যাদের ব্যাবসা। তারপর বাচ্চাটা মরল। গাবো একদিন কোথায় গেল নীল প্যান্ট পরা আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে ছিদাম জানতে চায়নি।

তার মন তখন কেমন করছিল ফুলদিয়ার খোড়ো ঘরের একটি স্ত্রীলোকের জন্য, যার নাম কুন্তা, যার কোলে কেবল গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের আগে সে রেখে এসেছিল গাবোর কুড়ানো বাচ্চাটার মতো চিমসে একটা বাচ্চা মেয়েকে, সুনিশ্চিতভাবে তারই ঔরসে কুন্তার গর্ভে যেটার জন্ম হয়েছিল।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, দই-কাদার পিছল পথে ছিদাম থুপথুপ হাঁটে, বেলা পড়ে এসেছে। এ ছিদাম সে ছিদাম নয় সে তো জানা কথাই। ফুলদিয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে মনটা তার ধাত ফিরে পেয়েছে খানিকটা।

বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেকদিন আগেই . কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অসময়ে মা-বউ-মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জা, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা এই ভয়। ঘরে যখন ধান থাকে, তৈজসপত্র থাকে, গাইবাছুর থাকে, বউয়ের পইছেটইছে মাকড়িটাকড়ি রুপো-সোনার গয়না, চারিদিকে আশাভরসা ছড়ানো থাকে বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার—তখন পুরুষ মানুষ খেয়ালের বশে হোক, বৈরাগ্যে হোক, গোসায় হোক, মা-বউ-মেয়ে ফেলে গিয়ে অনায়াসে দু-একটা বছর বাইরে কাটিয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বাড়ি ফিরতে পারে—বাড়ি ফিরেই কৃতার্থ করা যায় বাড়ির লোকগুলিকে। কিন্তু গাঁয়ের যত কাছে এগোচ্ছে থুপথুপ পা ফেলে তত যেন লজ্জা ভাবনার তোলপাড়টা বাড়ছে ছিদামের মনের মধ্যে। সে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল তখন, যখন আর কোনো সন্দেহই ছিল না যে সবই মরবে, সে সুদ্ধ। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যও সে পালায়নি, সবাইকে বাঁচাবার উপায় খুঁজবার জন্যই পাগলের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। কিন্তু এতদিন কাজে লাগলেও ফুলদিয়ায় পা দেবার পর আজ এ সব যুক্তি যেন ভাবনার বানে কুটার মতো ভেসে যাচ্ছে।

কে যেন মনে বসে প্রশ্ন করছে : সবাইকে বাঁচাতে চাইলে সঙ্গে নিলে না কেন সবাইকে ? তুমি বেঁচেছ—ওরাও বাঁচত—তোমার মা বউ মেয়ে !

হয়তো বাঁচত— কুন্জা। কীভাবে বাঁচতো ছিদাম জানে। গাবোর মতো মেয়েটার কঙ্কাল কাঁখে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরত ভিক্ষে করে, মেয়েটা মরলে নীলপ্যান্ট পরা কারও সঙ্গে চলে যেত অন্য সুখের সন্ধানে।

তবে সে বাঁচত। সে যখন বাঁচাতে পারল না, কুন্জা যেভাবে বাঁচুক তার তো কিছু বলবার থাকত না।

বাড়ি তার নেই, বেদখল হয়ে গেছে, বদলে গেছে—অথবা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বাড়িটা কী অবস্থায় কার হয়ে আছে এ বিষয়ে খটকা ছিল ছিদামের কিন্তু বাড়ির কেউ যে তার বেঁচে নেই এতে সন্দেহের লেশটুকু তার ছিল না। কুন্জা মরে গিয়েছে ধরে নিয়েই অনেকদিন ধরে অনেকরকম উদ্ভট পরিকল্পনা সে গড়ে তুলেছে কী করে বাঁচানো চলতে পারত কুন্জাকে—সকলকে ! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা হলেও বড়ো প্রিয় ছিল পরিকল্পনাগুলি তার কাছে।

তাই, বাড়ি তার ভালো আছে দেখে, বাড়ির সামনের শিউলি গাছটা আজও ঝাঁকিয়ে উঠেছে দেখে আর সেই তলায় সাবান-কাচা তাঁতের কোরা রঙিন শাড়ি পরা কুন্জাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছিদাম থ বনে যায় ! কলসি কাঁখে ঘাটেই কুন্জা যাচ্ছিল, আগে যেমন যেত। ছালা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো একটা লোককে বাড়ির বেড়ার সামনে দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কথা মনে জাগে ছিদামের : আজও কুন্জা বেলা শেষ করে ঘাটে যায় ? ঘাট অবশ্য লাগাও, তবু—

চেহারা ফিরেছে কুন্জার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুন্জাকে। এ বড়ো অদ্ভুত কাণ্ড, নয় কি ! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ-সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতি হয়ে গেছে !

কুন্জা ঝেঁজে বলে, বাড়ন্ত সব, আর এক বাড়ি যাও।

ছিদাম বলে, চিনলা না মোরে ? আমি যে ফিরা্যা আলাম।

কুন্জা দুপা এগিয়ে যায়।—তুমি ফিরা্যা আসছ ? কন থেইকা আইলা তুমি ?

সে যেন ভূত দেখেছে। এই মাটির পৃথিবী না মৃত্যুর দেশ কোথা থেকে আজ সে এই ছায়াচ্ছন্ন পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হয়েছে এ বিষয়ে তার রীতিমতো সংশয়।

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, যামু গা ?

ক্যান ? যাইবা ক্যান ? দাওয়ায় কুন্জা ভালো পাটি বিছিয়ে দেয় ঘর থেকে এনে, বলে, বসবা এক দণ্ড ? জলডা নিয়া আসুম ? ঘরে এক পলা জল নাই, কমু কি তোমারে।

কুন্জা একরকম পালিয়েই যায় কলসিটা তুলে নিয়ে কিন্তু আদর করে পাটি পেতে বসিয়ে গেছে বলে মনটা বিগড়ে যায় না ছিদামের। ঘাট থেকে ফিরে আসবে কুন্জা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। ও শুধু একটু দম ফেলতে গেছে, সব কথা বিচার করে দেখতে গেছে ঘরে এক ফোঁটা জল নেই বলে জল আনতে যাবার ছুতো করে ! দম ফেলার দরকারটা, বিচার বিবেচনার প্রয়োজনটা জড়িয়ে আছে ওর বেঁচে থাকার, বাগানে ফুল ফোটাবার, রঙিন শাড়ি গায়ে জড়াবার, পরিপুষ্ট হবার রহস্যের সঙ্গে। তাকে বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসিয়ে নইলে সে কখনও গা ধুতে জল আনতে যায় ! তার বাড়ি ছিল এটা। ও ছিল তার বউ। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘর এবং ঘরের ভেতর দিয়ে আর এক ঘর হয়ে উঠান রসুইঘর গোয়াল সব দেখে ফিরে এসে পাটিতে গুম হয়ে ছিদাম বসে থাকে।

বাইরের দাওয়ায় বসে থাকা পর্যন্ত রহস্য তার আয়ত্তে ছিল, বাড়ির ভেতর ঘুরে আসবার পর সে হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। গাবোর মতোই কোনো একটা পুরুষকে বাগিয়ে কুন্জা বেঁচে থেকেছে,

রঙিন শাড়ি পরেছে, পুড়স্ত হয়েছে, জানা কথা। কিন্তু তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে শহুরে শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধনসামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বাড়ির বুড়ি ঝি সুবালার মাকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন করে গড়া চালার নীচে কোনো একজন রাঁধুনি রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম।

বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসে এদিক ওদিক একটু ভাবতে না ভাবতে অনেক পথ হাঁটার ফলে ঝিম না ধরে গেলে ছিদাম বোধ হয় উঠে পালিয়ে যেত আর একবার।

ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুব্জা একটু রাগ করে। প্রকাশ্য রাস্তার সামনে এখানে এই বেশে এই চেহারায় বসে থাকাটা কি উচিত হয়েছে ছিদামের, কত লোক না জানি দেখে গেল তাকে, কত লোক না জানি কত কথা বলেছে কুব্জার নামে !

কে আর কি কইব তোমার নামে ? কইও আমি ফিরা আইছি। কাইল কইও।

কমু ?

কইবা না ?

আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।

কুব্জা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামি খাটে গদি, তাতে তোশক, আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার !

তামাক দিবার পার এক ছিলুম ?

কুব্জা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের। একটা সিগারেট নিয়ে হুস করে একটানে ধারয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছিদাম ভাবতে থাকে।

আসি। বলে কুব্জা বেরিয়ে যায়। পরে ফিরে এসে বলে, সুবলের মা, ঠাকুর সব কয়টারে বিদায় দিলাম। ব্যাটাব্যাটিরা কি বজ্জাত জানো, কওন মাত্র গেল গিয়া। আমারে মানে না।

কারে মানে ?

ললিতবাবুরে।

অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কুব্জা জবাবটা দেয়, বজ্রের মতো স্পষ্ট শোনে ছিদাম। অনেক কিছু চোখে দেখে সে অনুমানে আগেই শুনেছিল বলা যায়, এখন সেটাই প্রমাণিত হল মাত্র। আইনে প্রমাণ না হলে চাষাভুসার মন মানে না।

ললিতবাবু কখন আইব ?

আইজ আইব না।

ছিদাম ভাবে, তাই এত মেয়েলিপনা ! ললিতবাবু আজ আসবে না, যদি আসবার কথা থাকত তবে কুব্জার চালচলন কথাবার্তাও অন্যরকম হয়ে যেত।

যামু ?

ক্যান যাইবা ? বস। কই ছিলা এতকাল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে হাত-পা ধোওয়ার প্রয়োজন জানানো মাত্র কুব্জা তাকে পরিষ্কার কাপড় ও গামছা দেয়, ভিতরের রোয়াকে জলও দেয় নতুন বালতি ভরা, কাঁসার ঘটি দেয়, নতুন। তৈজসপত্র আবার হয়েছে কুব্জার, আগের চেয়ে ভালোভাবেই হয়েছে। গয়নাগাঁটি কেমন হয়েছে বলা যায় না, কানে পুরানো মাকড়ি দুটি ফিরে এসেছে চোখে পড়ে। ললিতবাবুর কাছেই মাকড়িটা ছিদাম বিক্রি করেছিল।

খিদেয় নিজেকে অসুস্থ ঠেকছিল ছিদামের। মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার ধুতিখানি পরে ঘরে গিয়ে সে বসেই থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাগ্রহে কুব্জা দু-একটা কথা বলে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, তাকে কিছু খেতে দেবার কথাই তোলে না। ছিদাম শেষে মরিয়া হয়ে বলে, মুড়ি চিড়া আছে না কিছু ?

কুব্জা গুটিসুটি মেরে তার দিকে কাত হয়ে বসেছিল, তড়াক করে যেন লাফিয়ে উঠে বলে, দেই দেই ! অখনি দেই।

এক ডালা মুড়ি আর এক খাবলা গুড় সে এনে দেয় ছিদামকে, তিনজনের খাবার মতো। ছিদাম মুড়ি চিবোতে চিবোতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

কুব্জা দীপ জ্বালে, ধুনো পোড়ায়। বেড়ায় টাঙানো মালা জড়ানো সেই পুরানো আবছা ছবিটার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মুড়ি চিবানো সাঙ্গ করে জল খেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ছিদাম। সন্ধ্যা সেরে আবার নিঝুম হয়ে বসে থাকে কুব্জা তার দিকে পাশ ফিরে।

কেমন যেন হয়ে গেছে কুব্জা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা। এতক্ষণের লক্ষণগুলি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ছিদাম। নিজে থেকে যেচে সে তাকে এতটুকু আদর যত্নও করেনি। তামাক চাইলে সিগারেট দিয়েছে, মুখ হাত ধুতে চাইলে কাপড় গামছা জল দিয়েছে, খেতে চাইলে মুড়িগুড় খেতে দিয়েছে। দিয়েছে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে, আগ্রহে একেবারে যেন অধীর হয়ে পড়ে, কিন্তু চাইলে তবে দিয়েছে, যা চেয়েছে, শুধু সেইটুকু। কিছু যেন খেয়াল নেই কুব্জার, মনে নেই। একদিন সে স্বামী ছিল সেটা নয় বাদ গেল, একটা মানুষ ঘরে এলে, একটা মানুষকে ঘরে ডেকে বসালে, তার সুখসুবিধার দিকে যে একটু তাকাতে হয় তাও কুব্জা ভুলে গেছে। খেয়ে উঠেছে, তাকে এখন আর একটা সিগারেট দিলে হয়। না চাইলে কি দেবে ! চাইলে হয়তো লাফিয়ে উঠবে দশটা দেবার জন্য।

তবে, গোড়ায় ভড়কে গিয়ে বিদায় নিতে চাইলে কুব্জা তাকে বসতে বলেছিল। মুখ ফুটে ছিদামকে বলতে হয়নি, বসুম না কী ? তা, এক হিসাবে ধরলে, এতকাল পরে ফিরে এসেই চলে যাওয়ার কথা বলা মানেই তো ডেকে বসতে বলতে মনে করিয়ে দেওয়া !

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ছিদাম। কুব্জাকে এ ভাবে আবিষ্কার করার অস্বস্তি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু। বাইরে বাদলার আঁধার, ঘরে পিদিমের মিটিমিটি আলো, তারা দুজন থাকলেও তাদের ঘিরেই যেন নির্জনতা আর স্তব্ধতা থমথম করছে। তার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বউটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতি—নতমুখে ঝিম হয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। ছিদামের মধ্যে যুগযুগান্তের পুঁজি করা স্তূপাকার রহস্যানুভূতি আর ভয় পাকিয়ে পাকিয়ে মাথা তুলতে থাকে ধীরেধীরে। এ রকম কত গল্প সে শুনেছে কত লোকের মুখে। দশ পনেরো বছর পরে বিদেশ থেকে মানুষ ফিরল সাঁজসন্ধ্যায়, দেখল ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিল তেমনই গিজগিজ করছে বাড়িভরা আত্মীয় পরিজন—অথবা ভেঙেচুরে গেছে ঘরবাড়ি, তার মধ্যে মাথা গুঁজে আছে দু-একজন আপনার লোক। অথচ অনেকদিন আগেই একরাত্রে রোগে কিংবা দুর্ঘটনায় ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব মরে বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর সে পোড়োবাড়ির ধার দিয়ে কেউ হাঁটে না ! বাড়ি যে তার শুধু মায়া, আপনজনেরা রক্তমাংসের জীব নয়, বিদেশি মানুষটা তা শুধু টের পেয়েছে বউকে কাঠের বদলে উনানে নিজের পা গুঁজে রাঁধতে দেখে অথবা কোনো জিনিস চেয়ে সেটা আনতে বউকে একঘর থেকে আর এক ঘরে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখে।

কে জানে এ ঘরবাড়িও তার মায়া কি না ! কুব্জা হয়তো সুশ্রী সুন্দর করেছে বাড়িটা, নিজেকে করেছে সুন্দরী তাকে ভোলাবার জন্য। গায়ে হাত দিয়ে দেখবে একবার কুব্জার গায়ে খাঁটি রক্তমাংস কি না ?

মা ও মেয়ের কথা এতক্ষণ জিজ্ঞেস করেনি খেয়াল হয় ছিদামের। খানিকটা সে কাছে সরে যায় কুব্জার।

নাই, কেউ নাই, সগ্‌গলে মরছে। কুব্জা বলে মুখ না ফিরিয়েই, আমি পোড়াকপাইলা আমি ছাড়া মইরা জুড়াইয়েছে সব।

ছিদাম একটা হাত রাখে কুন্তার পিঠে। কুন্তা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, তাকিয়েই থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ সোজা করে আগের মতোই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেড়ার দিকে।

কী বলবে কী করবে তারা ভেবে পায় না, তেমনি ভাবেই বসে থাকে দুজনে। আর একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানা যেতে পারে, এ কথাটা সবে মনে পড়েছে ছিদামের, বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

কেডা ? কুন্তা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিসফিস করে কুন্তাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি ?

কুন্তা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কী করন যায় এখন ?

কী জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়, আবার ললিত ডাকে। কুন্তা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মতো বসে থাকে।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভিতরের রোয়াক থেকে ভিখারির ছাড়া পোশাকের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বাঁশবনের ধার ঘেঁষে রাস্তায় নেমে পড়ে। টিপিটিপি বৃষ্টিটা তখন ধরেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, বিদ্যুতের ঘনঘন চমক ও আওয়াজ।

পেটব্যথা

কথা মতো মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কী একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, ওগো ওঠো। শুনছ ? ওঠো গো।

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

এত তাড়া কীসের, আঁ, কীসের তাড়া এত ? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কত্খনে কালীকে তাড়িয়ে হাড় জুড়োবি ভেবে ?

এ পর্যন্ত বললে কোনো কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে এসে হাইটাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক জের চলে ভৈরবের গোসার।

হাঃ, সে বলে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মতো, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে-টেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মত পেলে একটা ছাগল বেচতে চেয়ে পাগল হবে সে তো ডালভাত।

এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

ছাগল লোকে বেচে না পোড়ার মুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে ? মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, মেয়ের কথা বলো না যদি শরম থাকে একরতি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো ! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচত মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে খেতে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া ! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

ছাগল বেচলে বাঁচত ? মানোর মার ধাঁধায় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, ছাগল কোথা ছিল তখন ? কালী তো জন্মালে দু-চার দিন আগে, মানো যাওয়ার দু-চার দিন আগে ওই গোয়ালঘরটায়।

ওর মাটাকে বেচা যেত না ? বাচ্চা কটাকে ?

কার ছাগল কী বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব ? আর সবে বিইয়েছে দুটো তিনটে দিন আগে ?

রওনা দেও না ? এসো না গিয়ে ভালোয় ভালোয় ? মানোর মা বলে লড়াইয়ে জেতা রানির মতো, বেলা যে দুকুর হয়ে যাবে সদরে পৌঁছতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে ?

গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দু-পা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পৌঁছবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বউয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্মভোর খেত চষে আর গোরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বারবার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগের সস্তা শাড়ির পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই কটা পাড় আজও টিকে আছে, গোরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্যন্ত বুঝি ভালো চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গোরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙা গোয়ালের ফাঁকা চালাটার নীচে পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জ্বেলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা কটাকে নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও কটা বাচ্চা টিকত কে জানে ! কয়েক দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো ? জাফর শুধিয়েছিল। বাঁচাব। বলেছিল ভৈরব উদাসীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি ছাগলের মাংস একদিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ যদি কোনো মতে তুলে আনা যায় কাল্লুর খেত থেকে।

তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরেনি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্তত দশবার মনের মধ্যে জোর গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ওকথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয়তো পেটের জ্বালায়। মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয়তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয়তো মরত না, তবু না খেয়ে যে মরেছে এ কথা কোনো মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তা হলে ? জোয়ান মদ্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনও হয় ! সেও তো মরেনি, তার আর দুটো ছেলেমেয়ে। দুর্ভিক্ষটা কোনোমতে সামলেছে ভৈরব। একবেলা আধবেলা শাকপাতা খুদকুঁড়ো কোনোমতে জুটিয়ে হাড়-চামড়া টিকিয়ে রেখে কোনোমতে বেঁচে পেরেছে সবাই মিলে,—মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনও অসুখ হলে। অসুখটা যদি না হত, না খেয়ে মানো মরত না, শাকপাতা খুদকুঁড়ো তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত খেতে খেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেককাল যেমন ফসল কারও মাটিতে ফলেনি।

আর কটা দিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকি খাজনার দায়ে। তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন !

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, বলি চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো ?

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচ-পুরুষে শুঁড়ির কর্ম তো কেউ করেনি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষি। তার এক দূর সম্পর্কের কুটুম সদরে মদ বেচে টাকা করে। এ জন্য তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ-মা-বউ মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

এই যাচ্ছি হেথা হোথা।

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, রাগ কোরো না। ওটা নিছক তামাশা। তামাশা বোঝ না, কেমন চাষি তুমি ? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভালো, তা কি জানি না আমি ? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক কটা দিন আর চলে না কোনোমতে।

সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে ? কৈলাস বলে আশ্চর্য হয়ে, তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় ভৈরব ! গাঁয়ের গোরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারও অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে ? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি !

পুবের আকাশে সূর্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোটো-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল

তৈরি করে দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়ডর ভুলে যায়।

আপনাকে গোরু-ছাগল দেওয়া মানে তো খয়রাত করা।

বটে না কি ? সবাই তাই আমাকে গছিয়ে দিতে পাগল ! নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে, শোন বলি তোকে, ছ টাকা সবাই পায়, তোকে আট দিচ্ছি আর কাউকে বলিস না। এমনি ছাগলের জন্য আট টাকা করে দিতে হলে ব্যাবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিঠিটা দিবি যা—পেনসিলে লিখে দিলাম তো কী হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে।

রও, রও। ভৈরব সাতঙ্কে বলে, আট টাকা কীসের ? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচব।

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা ?

কী জন্যে ? আমার ছাগল আমি যেথা খুশি নিয়ে যাব।

মাইরি ? কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মতো, আমি দশ-বিশ হাজার ঢেলে লাইসেন্স নেব সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খুশি নিয়ে গোরু-ছাগল বেচবে ? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল কাপড়, কেরোসিনের মতো গোরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না। আরে বোকা, আইন যদি না থাকবে তো অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স ?

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্তভাবে বলে, বোকা পেলে না কি কৈলাসবাবু ? আইন শুধিয়েছি। চালানি কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিও তখন।

ভৈরব বলতে শুরু করলে কৈলাস ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশজনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম শুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রয় হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুশি হয়। শুধু ভালো দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ার খেদটা তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটেকুটে গর্ভিণী কালীকে হয়তো খেয়ে ফেলবে, নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিনকাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গোরু মহিষ পাঁঠা খাসি ছাগলের কোনো তফাত নেই, মাংস হলেই হল। কুকুর-বেড়ালও নাকি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক জোগান দেয় তাতে। কালী ভালো ঘরে পড়েছে। ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ি, ছেলেপুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়। বাড়ির লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার একরকম চলে যাবে। আধ সের আলু এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ-আনার হলুদ লংকা ধনে আর জিরে, চার পয়সাতে সোডা আর দু-আনার একটি কাপড় কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবেচিন্তে দু-আনার তামাকপাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্য।

তারপর পথের ধারে তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলেভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়োই পছন্দ করে।

বাদাম তেলের চেনা গন্ধে পুরানো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে, জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্যন্ত। পেট ভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো

উড়িয়ে যে মিলিটারি লরিগুলো চলছে, দিক কাঁপিয়ে সেগুলি চলতে শুরু করার পর দেখতে দেখতে দুর্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপশোশ দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা পেটের তেলেভাজার তলে !

ঘুম আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভালো। তেমন নাছোড়বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোনো গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিস কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগানো ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায়নি, এবার শহর ছাড়িয়েই দুদিকে ছড়ানো পরের খেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতোই তাজা খুশিতে। তার নিজের খেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যে দিকে তাকায় সেইখানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দুজন ষন্ডাগুন্ডা চেহারার মানুষ।

ছাগল বেচলি ভৈরব ?

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, বেচেছি গো কৈলাসবাবু, তোমার আশীর্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।

তাই না কি ! তা বেশ করেছিস, আমার বেচাকেনার ঝক্কিটা তুই নিজেই পুইয়েছিস। আট গন্ডা কমিশন দেব তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোক দুজন ভৈরবকে ধরে কোমরে-বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুণে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, হুঁ, খরচা করা হয়েছে এর মধ্যে। দাঁড়া, হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনত—সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকিটা তোর।

এ কেমন ধারা তামাশা কৈলাসবাবু ? ছাড়ো আমায়, ছেড়ে দাও।

তামাশা ? ব্যাটা, তুই আমার তামাশার পাত্র ? দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গোরু-ছাগল কেনাবেচার লাইসেন্স কারও নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে ? ঘাড়ে তোর কটা মাথা রে হারামজাদা, গটগট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে ?

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্তনাদের সুরে বলে, ডাকাতি করে গরিবের পয়সা কেড়ে নেবে ? নাও---আমি থানায় যাব, নালিশ করব।

থানায় যাবি ? নালিশ করবি ? কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়, যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা। বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথচলতি রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দুজন কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে,—কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে ! তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে,—দৌড়ে পালায়নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলেদুলে, পিছনে চলছিল সঙ্গী দুজন, কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে মুচড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সঙ্গে রক্ত তুলতে দেখে,

রাম-শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু-মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি খানা থেকে আঁচলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

দুহাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তেবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনই সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাইয়ের সঙ্গে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাসপাতালে পৌঁছেই আর একবার বমি করে ভৈরব। একগাদা তেলেভাজার সঙ্গে উঠে আসে একগাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, কী হয়েছে ?

মধু বলে, রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্তবমি করছিল ডাক্তারবাবু। আমরা তুলে এনেছি।

যদু বলে, কারা না কি মারধোর করেছে।

শ্যাম বলে, পেটে লাথি মেরেছে একজন।

রাম বলে, ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে ! মরে যদি যায় !

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, লাথি মেরেছে ? কে লাথি মেরেছে ? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে ?

রাম বলে, আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাসবাবু।

শুনে বলাই বলে, হুম।

শ্যাম বলে, মোরা দুজন আসতেছিলাম, কাছে যেতে যেতে লাথি মেরে কৈলাসবাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা একটু, লোকটাকে দেখতে দাও ! বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভৈরবকে পরীক্ষা করে, লোকদেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভালো করে দেখে। তারপর সে রায় দেয়, কলিক। কলিক হয়েছে।

বলাই বলে, আঃ ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলিকের ব্যথা হল, যাকে তোমরা শূলবেদনা বল। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছ না বমি তেলেভাজায় ভর্তি ?

মধু বলে, কিন্তু ডাক্তারবাবু—ও রক্তটা ?

কলিকে রক্ত ওঠে।

যদু বলে, পরশু মোকে শূল বেদনায় ধরেছিল ডাক্তারবাবু। রক্ত তো ওঠেনি ? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।

রোগের লক্ষণ সবার বেলা একরকম হয় নাকি ?

শ্যাম বলে, আমরা যে দেখলাম ডাক্তারবাবু লাথি মারতে ?

দেখেছ তো বেশ করেছ। ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানো তুমি ? লাথি কে মেরেছে কে মারেনি জানি না বাবু, তেলেভাজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।

রাম বলে, কৈলেসবাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্তবমি করতে লাগল—

যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও, যাও, বাইরে যাও, ভিড় কোরো না। ওষুধপত্তর দিতে দাও মানুষটাকে, চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে হাসপাতালের দুটি লোহার খাটের একটিতে। আর একবার সে বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে

কম, রক্ত ওঠে বেশি। মনে হয়, রক্তবমি করে তার পেটব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে। তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।

বাইরে থেকে গুঞ্জন কানে আসে কুঞ্জ ডাক্তারের, বাড়ি যাবার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরোতেই ক্রুদ্ধ ঝাপটার মতো এসে লাগে গুঞ্জনধ্বনিটা। ইতিমধ্যে রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তেঁতুলগাছটার তলায় জোট বেঁধে তাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাশ কাটিয়ে খানিক তফাত দিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার এগিয়ে যায়।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমের আয়োজন করছে কুঞ্জ ডাক্তার, সেই উদ্ধত ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ায় তার বাড়ির দরজার সামনে।

বাইরে থেকে হাঁক আসে : ডাক্তারবাবু ! ও ডাক্তারবাবু ! শূলবেদনার রুগি এসেছে আর একজন—কলিকের রুগি।

ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে গিয়ে দেখতে পায়, তারই সদরের চৌকাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা বলে, পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে ডাক্তারবাবু, কলিক হয়েছে।

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হন্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে ! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ও সব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু একখানা ভালো, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভালো, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল !

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয় : উঠে হাঁটো দু পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে : কী হল গো ? বলি হল কী ?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বউটা তার ন মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপিচুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপিচুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে না, একগুয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে ? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ, একদম যেন মিত্যু যন্তনা, মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনে টুনে ঠিক করে দিলেন পা-টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও— উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দু পাশের ডালপালা দু জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে : শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন ?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন !

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে ! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা ? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন ? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এ সব কথা—এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী ? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একী কথা ? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে ? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা ?

নইলে ইদিকে সে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জানো ? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে ? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুরঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে ? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি ?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুসড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনি। ও সব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ও সব শাড়ি।

মদন তাঁতি ! মদন তাঁতির কাপড় ! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল ? বলল ও সব কথা ? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে : এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত !

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ও সব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে : মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে-এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা !

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা : ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের ? কী হতে পারে ? গুরুতর কিছু যদি হয়.....

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না ?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

এখনও গেলে না যে ?

যাব। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত ? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগগা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ : ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু ? সুতো নেই বুঝি ?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে ?

বেনারসি ? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে ! এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি ?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুরশিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁতঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল ? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব ?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে ?

তা ছাড়া কী আর ? কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে ? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি ?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি ?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ায় অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় : ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন ? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপিচুপি ?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে ?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব ? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে ? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

কংক্রিট

সিমেন্ট ঘাঁটতে এমন ভালো লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেন্টের স্তূপে, দুহাত ভর্তি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে খাপড়ায় সিমেন্ট, নয় শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে। জোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনও খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনও গোপনে করে। কী চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরন। মুক্তার বুক দুটির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাশা করে, আবার যখন দেখা হবে।

এই শালা খচ্চর !

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব বসানো কিম্ভূত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরও বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হুলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হুলো বেড়ালের মতো রগচটা আর বেঁটেখাটো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও। যত বদমেজাজি হোক, যে কোনো হাসির কথায় হ্যা হ্যা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারও দুঃখদুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় যেন রোলার মেশিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

রুমাল-পোঁছা এলো না দিকি ?

না।

এলো না এলো, তোর কি রে বাপ্পোত ? ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন ? আমি আছি কী করতে ?

কথা না করে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দুবার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ— এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢং-এ, উৎসুক চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।

দু মাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—

বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগচটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁ-র টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কী রকম দেখতে ? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব !

খিদেয় ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কিনা তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁ-র জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না

মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এই সব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বউটার মতো। বউ একটা বটে বেন্দার ! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কী বাস রে মাগিটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, বুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেঁচকি।

হঠাৎ বড়ো শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কী ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি ; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেন্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মতো, গলায় দুবার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাত বচ্ছর খাটছি, তুই শালা দু-চার বছরে খতম হয়ে যাবি।

ট্যাঁক ফ্যাফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাঁকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেশিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়ে চড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁত ঠেকে গিয়ে খিঁচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিসহিসানির আওয়াজে সে বলে, যা যা, ভাগ। পালা শিগগির।

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, শোন। এখানে এইছিলে খপর্দার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বি—খপর্দার।

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয় তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কাল ঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উলটেপালটে পাক খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কী রে !

জল খেলি ? গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

হাঁ খেলাম।

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাত পায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারও। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কী তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেশিনে পিষে থেঁতলে মারা গেছে খানিক আগে— এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কী রকম হল ? হুহু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে

ভাসাভাসা শুনতে পেয়েছে কীসে কী ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে ওখানে গন্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, আহা রে ! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরানটা গেল কপাল দোষে।

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, বারবেলার কপাল দোষ ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে ? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাগি বুড়ো ! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস ? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোটো ছোটো দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয়তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আরেকবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপাটে, রোলার মেশিনে ও গেছ্‌ল কেন ?

বদলি করল না ওকে ক রোজ আগে ? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা।

হাঁ—? বটে—?

কী তবে ? গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, কী বলতে চাস তুই ? এক রোজ যে কাজ করেনি সে কাজে বদলি করবার মানেটা কী ?

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথায় মানে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছিদামও তাই ভাবছিল।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড়ো খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছা জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেই সঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বকশিশ। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটোখাটো দয়া আজও তার জোটে, ছোটোখাটো কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গোখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ। আপশোশে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়ার মতো কী বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙাতদের কাছে নিজের মান বাড়াবার কী ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয় আর এমনভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড়ো বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক ঠিকানা ছিল না. কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম ! একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াত ওপর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেশিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না !

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো। উশখুশ করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা। চুপিচুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কী বলছ ? বোকার মতো কী কাজ ?

সবাই কি বলাবলি করছে জানিস ?

কী বলাবলি করছে ? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

হুঁ, হুঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন ? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কি বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে, কীরে ছিদাম, খবর আছে ?

আজ্ঞে।

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে, চেয়ারে ! প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে, ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালোরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আর একটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না, কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষি দেব তোদের হয়ে।

তোর সাক্ষি চাই না।

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে—নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট-দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ চিৎকার শোনেনি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে ! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল-পোঁছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকি থাকে কারও কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপশোশে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মতো যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পোঁছার টুঁটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সেই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড়ো যে এক খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওলাদের ? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা ধরি মাছ না ছুঁই পানির কায়দায় ? কোনো যোগসাজশ কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া—

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনও না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দুপাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, এসো বোসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে-রাঁধা এটা ওটা খাওয়ায়, হাসি তামাশা রঙ্গরসে মশগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁখাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন ফিরন নড়নচড়ন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কী বুঝদার মেয়েটা, কত আপনভাবে তাকে। কদিন আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাত হয়ে থাকেনি আগেরই মতো হাসিখুশি আপনভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পোঁছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ট্যাক তার ফাঁকা থাকে না কখনও, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্যঘরের বাসিন্দাদের হইচই বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুব্জার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো—ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে বেন্দা কি দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠছে। সোজা সহজ একটা কথা বারবার মনে পড়ছে যে এ সব লোকের সাথে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, এদের সাথে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ির মতো বলে, কীগো, আজ রাঁধবে না ?

বলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখবিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না রাঁধবার, যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ

পেটটা ভালো করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি ! ও বছর পুষ্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নীচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

আলসেমি লাগছে পুষ্প।

মাকে ডাকি ? বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ করে বসে আছে লোকটা ঢেলে ঢুলে ?

চলো যাই।

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরও স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরও চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয় তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশেপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক, শ্যাল শকুনের কোঁদল থামল।

গলি থেকে আরও সরু গলি, তার মধ্যে ঘর বেন্দার, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফুর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাঁড়ের বদলে আজ কাচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

হুঁহুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামি চিজ।

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরও ছুঁচোল হয়ে চামড়া আরও বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর শেমিজ, রং বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভর্তি গেলাসের টলটলে রঙিন পানীয় থেকে।

ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাইনি ঠোঁটে।

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে একচুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ খেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

আরে আরে, রয়ে সয়ে খাও। রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিকটা জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, বাপস ! ভাগ্যে এলি এলি তুই এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়। প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কণ্ঠাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল। আরও দুবার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, তবে, কী আর হত ! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।

আরেক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছে থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সায়েবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সায়েব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড়ো রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

দুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে। বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁঝে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, কী হল, খাও ? হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভালো করে বসে আরেকটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাবখন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে একঘণ্টা তো কম করে।

গায়ে লেগে কানে কথা কয় রানী, তার মদ পেঁয়াজের গন্ধ ভরা নিঃশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙিন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, বাসরে, ধৈর্য নেই এতটুকু ? গেলাসটা শেষ করো ?

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল নিজেই তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আরেকটু মদ ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, আর তোমার ভাবনাটা কি ? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক চতুর আছ ওর চেয়ে, ওতো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

যাই বাবা ও ঘরে, কখন এসে পড়বে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোনো। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিয়ো। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের ? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিচ্ছু দিলে না পোঁছাবাবু ? তাহলে দেবে। চোখ ঠেরে রানী হাসে, বাতলে দিলাম, ভাগ দিতে হবে কিন্তু মোকে।

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই—তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো ছিদামের মতো। এই তার পথ ! আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনি ভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্ত বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

রিকশাওয়ালা

ময়দানে নধর পরিপুষ্ট গোরুগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছিল। ভদ্রলোক প্রথমে আঙুল দিয়া কাছাকাছি কয়েকটি, তারপর হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা চারিদিকে ছড়ানো সবগুলি গোরু দেখাইয়া বলিলেন, ওরা সব নাকি আদর্শবাদের জীবন্ত রূপক। জীবন্ত, বাস্তব ও প্রামাণিক রূপক। জীবন্ত যে তাতে আর সন্দেহ কী। বাস্তব প্রমাণেই। বাংলার সমস্ত গোহাটা, মাঠঘাট ও গো-পোষা গেরস্ত ঘরে প্রত্যক্ষ, শহর ও মফস্বলের দুধের স্বাদ-গন্ধ ভোলা বা স্বাদ-গন্ধ না-জানা ছেলেপিলেগুলির সংখ্যা ও চেহারায় তথ্যমূলক এবং চিতার ধোঁয়া ও কবরের মাটিতে পরোক্ষ প্রমাণ।—হোয়াট, আঁ আঁ, হোয়াট ? ঠিক না ?

তার ঢুলু ঢুলু লাল চোখে জল আসিয়া পড়িল। না চাহিতে গছানো সরকারি বিবৃতির মতো আমার পাঁজরে সজোরে আঙুলের খোঁচা মারিয়া স্বীকার করিলেন যে, হুইস্কি খাইতেছিলেন। মোটে চার পেগ। নেশা হয় নাই। নেশা হয় না। নতুন কন্ট্রাক্ট পাইলে, বিলের টাকা পাস হইলে, ট্যাক্সের নোটিশ আসিলে ব্যাঙ্কে কত ছিল কত হইয়াছে আর কত হইবে ভাবিলে এবং এ রকম আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বুকটা তার ধড়ফড় করে, দিনের বেলাই খান। দিনে শুরু করা প্রায় অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশা হয় না। ময়দানে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। ভগবান যদি দয়া করেন, ফিরিয়া গিয়া আর গোটা চারেক পেগ খাইলে সন্ধ্যাতক নেশা লাগিতে পারে।

বাঁচাই অসম্ভব দাদা। টাকায় দু সের দুধ, তার অর্ধেক জল, তাও পাওয়া মুশকিল। রিকশাওয়ালা ছআনা নিলে—শালা ব্লাডি ডাকাত। ওই হোটেল আর এই মনুমেন্ট, এইটুকু আসতে ছআনা—ছ ছ গন্ডা পয়সা ! দেশ কি অরাজক ?

ভদ্রলোককে নামাইয়া দিয়া রিকশা রাখিয়া অ্যাসফল্ট দেওয়া ময়দানি ফুটপাথের প্রান্তে ঘাসের রাজ্যে আসিয়া রিকশাওয়ালা দুহাতে পেট চাপিয়া উবু হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ কাশিয়াছিল মনে আছে, ঘুংরি কাশিতে যেমন হয় তেমনিভাবে হুস্‌প হুস্‌প শব্দে আটকানো দম টানিয়া টানিয়া। কেন কাশিয়াছিল জানি। রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, দশটা মিনিট বসিয়া থাকিতে হয় না, বেশি রেটে ভাড়া মেলে, কতজন্মের পুণ্যফল ! টাকার দামের পুরানো সংস্কারটা এখনও টিকিয়া আছে, টাকার দাম যে কমিতে পারে ধারণায় আসে না। খরচ বাড়িয়াছে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু ভিন্ন কথা।

তাই হরেদরে যাতে সমান না দাঁড়াইয়া যায় সে জন্য এরা খরচ কমাইয়াছে। খাওয়ার বাবদেই বেশি যায়, এ খরচটা ছাঁটিয়াছে মোটা রকম। একদিন রাত এগারোটার পর কালীঘাট হইতে রিকশায় টালিগঞ্জ যাইতেছিলাম। রেলের পুলটার কাছে হঠাৎ রিকশা উলটাইয়া ডিগবাজি খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। খুব একচোট গালাগালি আর বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা চড় বসাইয়া দিব স্থির করিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখি, রিকশাওয়ালা সটান মুখ থুবড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। চড় মারার বদলে পানের দোকান হইতে শরবতের গ্লাসে পান-ধোয়া জল আনিয়া লোকটির সেবা করিতে হইল। মাথার উপরে আকাশে চাঁদটা ছিল প্রায় আস্ত। রিকশাওয়ালাটিকে ভালো করিয়া দেখিব বলিয়াই যেন সেই সময়টুকুর জন্য চাঁদ জ্যোৎস্নার জোর খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। লোকটির বয়স ত্রিশের নীচে। চিত হইয়া শোয়ার জন্য পেটের চামড়া খাদে নামায় ভাঁজ নাই কিন্তু ভাঁজের দাগগুলি বেশ স্পষ্ট। মুখের চামড়া মরা শুকনো ট্যাংরার মতো সিটা। চিকণ বিবর্ণ গোঁপের উপর বনেদি ধাঁচের

চোখা দীঘল নাকটা সশব্দ শ্বাস টানার সঙ্গে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিল। দূরে সেই শ্বাস টানার শব্দ যেন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কাছে আগাইয়া আসিতেছিল। একটু পরে টের পাইলাম, রেলগাড়ি আসিতেছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা মালগাড়ি টানিয়া একটা ইঞ্জিন আগুনের হলকা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া পরম উপভোগ্য বিরাট ঝনঝনির কলরবে পুলে উঠিয়া পড়িল।

তখন খেয়াল হয় নাই। আজ ময়দানে এই হৃদয়বান দার্শনিকের জীবন্ত উপমার কথায় মনে হইল, সে রাত্রে কল্পনা করা হয়তো আমার উচিত ছিল যে রিকশাওয়ালা ও ইঞ্জিনটার একই হাঁপানি রোগ হইয়াছে। একটি খটকা শুধু মনে খচখচ করিতে লাগিল। রিকশাওয়ালা জিদ ধরিয়াছিল প্রতিদিনকার নিয়ম সে কিছুতেই ভাঙিবে না, খাইতে যদি হয় আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সোয়ারি পাইলে সোয়ারি লইয়া ফিরিয়া দু-আনায় কেনা বুটি দুখানি বিনা পয়সায় পাওয়া ছোলার ডাল ও ছ্যাঁচরাটুকু দিয়া খাইবে। সামনের মিষ্টির দোকানে তাকে ছ-আনার দুধ মিষ্টি খাওয়াইতে আমাকে যেরকম ধস্তাধস্তি করিতে হইয়াছিল, ইঞ্জিনে কয়লা দিতে কি ড্রাইভারের সে রকম হাঙ্গামা ও পরিশ্রম করিতে হয় ?

বেচারার করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল আমাকে পুলিশেরও অধম ভাবিতেছে। আমি দাম দিলে অবশ্য সে খুশি হইয়া খাইত। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া দিই নাই। কেবল চুক্তির ভাড়াটা চুকাইয়া দিয়া বাকি পথটা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম।

আজকাল অভিযোগ শুনিতে পাই রিকশাওয়ালাদের পায়াভারি হইয়াছে। সোলজারগুলোকে ঠকিয়ে মোটা পয়সা পায় আমরা ডাকলে কথাই বলতে চায় না। স্পষ্ট মুখের ওপর বলে বসে মশায়, যাব না ! অনুযোগে যে পরিমাণ জ্বালা প্রকাশ পায়, কোনো রিকশাওয়ালা সেই অনুপাতে তেজ দেখাইয়া কোনো ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে বিশ্বাস করিতে পারিলে খুশি হইতাম। খুব খানিকটা খাতির আর সম্মান দেখায় নাই, সত্য বোধ হয় শুধু এইটুকু। ট্যাক্সিওয়ালার হুমকি আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের টিটকারিতে বাবুদের বেশি লাগে না। কিন্তু রিকশাওয়ালা জাতটাই নিরীহ গোবেচারি ভীরু। তাদের দেহ কাবু হয় জঘন্য শ্রান্তিতে যা প্রায় ক্ষয়রোগ ও হাঁপানি রোগের সমবেত আক্রমণের মতো : মৃদু এবং শ্লথ কিন্তু দুর্নিবার। মন কাবু হয় আত্ম-তুচ্ছতার কঠিন রোগে। সবাই গাল দেয়, হুমকি দেয়, ধমকায়। সবাই অন্যায় করে, অবিচার করে, অত্যাচার করে। সুস্থ সবল তেজস্বী মানুষ কয়েকবছর রিকশা টানিবার পর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ঝিমায়, বিশ্বাস করে যে রিকশা টানাটাই চুরি করা বা ভিক্ষা করার মতো হেয় কাজ। লোকে যে রিকশা চাপিয়া পয়সা দেয় সেটা শুধু অনুগ্রহ করা নয়, উদারতার পরিচয়ও বটে—রিকশা টানার অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা। অস্পৃশ্যরা কঠিন নোংরা কাজ করিয়া টিকিয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার মধ্যে জাতওলাদের যে উদারতা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ বোধ করে। নিরীহতম দু-একটি কেঁচো হয়তো যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে নিরীহ হেলে সাপ সাজিয়াছে, তাতেই চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে অনেকের। ছদ্মবেশী বিষাক্ত সাপগুলি যে কিলবিল করিতেছে চারিদিকে তাতে কোনো আপশোশ নাই।

এই নিপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলির সহজ সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করে। ভয় বা খাতিরের বিনয় নয়, বকশিসের লোভের খোশামোদ নয়, খাঁটি সৌজন্য। অন্যের আন্তরিকতাকে চিনিয়া গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার প্রতিদান যার মর্মকথা।

এই রোখো ! হিঁয়া রোখো !

সোয়ারির গর্জন শুনিয়াও মোড়ের মাথার কাছে প্রধান রাস্তাটির উপরে সেখানে গাড়ির ভিড়ের মধ্যে রিকশা থামানো গেল না। একটু আগাইয়া বাঁক ঘুরিয়া বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকিয়া রিকশাওয়ালা গাড়ি নামাইয়া রাখিল। সোয়ারি নামিয়াই রিকশাওয়ালার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

সোয়ারি বাবু নয়। লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ে গামছা কাঁধে শ্রেণির মানুষ। সেখানে কুড়ি পঁচিশটা রিকশা ছিল, রিকশাওয়ালারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লোকটিকে ঘিরিয়া ধরিল। পথিকও জমিয়া গেল কয়েকজন।

সোয়ারির সেদিকে খেয়াল আছে মনে হইল না। চড় মারিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রিকশাওয়ালার মুখের দিকে তাকাইয়া হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সে দুহাতে রিকশাওয়ালার ঘণ্টাসমেত ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।

মাপ কিজিয়ে ভেইয়া। কসুর হুয়া।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে আবার বলিল, মায় কভি এসা নাহি কিয়া ! বলিয়া রিকশাওয়ালার হাতটি তুলিয়া নিজের গালে চড় বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

আরে রাম রাম !

কতক্ষণ দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আলাপ করিয়াছিল জানি না, মিনিট দশেক পরে বন্ধু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন।

বন্ধু বলিলেন এতে সৌজন্যের কী আছে ? তোমার গালে চড় মেরে কেউ যদি ও ভাবে মাপ চায়, তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।

তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় তো যে ও আমার চেয়ে ছোটো লোক নয় ?—বলিয়া আমি যোগ দিলাম, আমি শুধু ক্ষমা করতাম। ওদের মুখের ভাব দেখেছিলে, কথা শুনেছিলে ? ক্ষমা করে ও রকম দিলদরিয়া হবার ক্ষমতা তোমার আমার নেই।

সেই দিনই রিকশাওয়ালা মহাবীরের কাছে তার মুশকিলের কাহিনি শুনিয়াছিলাম। সোয়ারি নিয়া সে চেতলায় গিয়াছিল। একটি বিধবা স্ত্রীলোককে লইয়া কালীঘাটে আসে। কালীঘাটে আত্মীয়ের বাড়ি স্ত্রীলোকটি আর খুঁজিয়া পায় না। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। মহাবীরেরও চেতলা ফিরিয়া যাওয়ার উপায় নাই। গাড়ি জমা দিতে হইবে। অনেক কষ্টে শেষে চেতলা এলাকার একটি গাড়ির খোঁজ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তাতে উঠাইয়া দিয়া রেহাই পায়। কালীঘাটে সোয়ারি পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়িটি চেতলা ফিরিয়া যাইতেছিল।

ও আপত্তি করল না মহাবীর ? ভাড়া ফসকে যাবার ভয় ছিল তো ?

আপত্তি কীসের ? মহাবীরের ভাড়াও তো একরকম ফসকাইয়া গিয়াছে ! বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীলোকটি যদি ডবল ভাড়া দেয়, দেখা হইলে চেতলায় সেই রিকশাওয়ালা—তাকে মহাবীর চেনে না—অর্ধেক মহাবীরকে দিবে। ভাড়া যদি অবশ্য না পায়—

আজ সকালে যা ঘটিয়াছে সেটা শিশুশিক্ষার গল্পের মতো শোনাইবে। বেলা তখন সাড়ে দশটা। শহর ব্যস্ত, বিব্রত উদ্‌বিগ্ন এবং একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

আমি অন্ধ বাবা। আমি অন্ধ ভিখিরি বাবা। আমায় পথটা পার করে দাও ! অন্ধ বাবা...

আরও কয়েক মিনিট এ ভাবে চেঁচানোর পর অন্য কেউ হয়তো তাকে পথ পার করিয়া দিত, একজন রিকশাওয়ালা আগেই কাজটা করিয়া ফেলিল। অন্ধকে যে দয়া করিল ঘটনাক্রমে সে রিকশাওয়ালা তাই উল্লেখ করিলাম। রিকশাওয়ালারাই শুধু অন্ধজনে দয়া করে এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়।

আমি ? আমি কি করিতেছিলাম ? আমি দেখিতেছিলাম অন্ধকে কেউ পার করিয়া দেয় কিনা, কে দেয় এবং কী ভাবে দেয়।

প্রাণের গুদাম

গুদামটা আগে ছিল পুরানো একটা শেড, তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেলে গুদামে পরিণত করা হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কন্ট্রাক্টর, মেঝেটা পাকা করে দেবার দায়িত্বও ছিল কন্ট্রাক্টরের। কথা ছিল নতুন টিন দেবার, কিছু কিছু যে দেওয়া হয়েছে নতুন টিন তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। মেঝেটা উঁচুও করা হয়েছে চারিদিকের জমি থেকে হাতখানেক, গুদামের বাইরের ভিটেটুকুতে সিমেন্ট ঝকঝক করে। ভেতরে ইট পড়েছে কী রকম, সিমেন্ট খরচ হয়েছে কত, লোক খেটেছে কতজন সে সব জানবার প্রয়োজন কারও হয়নি। জেনে লাভও নেই।

মাল বোঝাই হবার আগে গুদামের ভেতরটা ছিল আবছা অন্ধকার। মাল বোঝাই হবার পর তো মেঝে একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। তা ছাড়া, গুদাম একরকম একটা হলেই হল—মানুষ সহজে কোনো খাদ্য চুরি করে নিতে না পারে এইটুকু ব্যবস্থা থাকলেই যথেষ্ট। তাই বোধ হয় ফাঁকায় খাদ্যের বস্তাগুলি গাদা করে না রেখে শেডের নীচে ঘেরা জায়গায় ঢুকিয়ে সামনে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য বাঁচল, সেই সঙ্গে বর্ষা বাদলেও খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। আর কী চাই ?

শিবরামের হাত থেকে কন্ট্রাক্টটা ফসকে চলে গিয়েছিল মি. রায়ের হাতে, আত্মীয়তামূলক যোগাযোগের বাড়তি টানে, ঘুষে মি. রায় শিবরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি এ কথা নিশ্চয়। শিবরাম ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিল, শুধু টাকার ঘুষের আর সে রকম দাম যেন নেই অনুগ্রহকারীদের কাছে, দেবতার কাছে নিছক চাল-কলার নৈবিদ্যের মতো, সেই সঙ্গে ফুল চন্দন ধূপ-ধুনা প্রভৃতিরও দরকার হয়েছে আজকাল। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা থাকে তো ভালোই, নয়তো আনাগোনা, টুকিটাকি উপহার, মিঠেকথা, মোসাহেবি এ সব উপচারে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেও বজায় রেখে চলতে হয়। মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে তাহার ভুল হয়নি পরে শিবরাম তার প্রমাণ পেয়েছে। মি. রায়ের হাত থেকে কন্ট্রাক্ট খসে চলে এসেছে তার কাছে। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে কেন মি. রায় তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে সে যদি মানুষকে বশ করতেও আরম্ভ করে অন্যভাবে তবে আর কথা কী।

শিবরাম বলেছিল, এমন ফাঁকি আমরাও দিতে শিখিনি, আমাদেরও বিবেক আছে। তিনভাগ টিন মরচে ধরা, ফেলে দিতে হত। ভেতরে একটু সিমেন্টগোলা জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইট তো দেয়নি ভিটেতে—জঞ্জাল আর আবর্জনায় ফাঁপা করে রেখেছে। এমনিতেই লাখখানেক ইঁদুর বাসা করত, এখন শেয়াল গর্ত খুঁড়ে বাচ্চা মানুষ করবে !

শশাঙ্ক বলে, উপায় কী, এক জায়গায় তো জমা করে রাখতে হবে, বাজারে ছাড়লেই তো পড়বে গিয়ে আপনাদের এজেন্টদের হাতে। এমনি তবু গরিবদের পাবার ভরসা আছে দু-দশ ছটাক, তখন আর চোখেও দেখতে পাবে না।

ও সব আটা ময়দা চাল আমরা খাই না মশায়।

আপনারা ভালো জিনিস খান, কিন্তু বেচেন তো এ সব। খাবার জন্যে না কিনুন, চালান দেবেন, নয় চালানি দামে আশেপাশে বেচবেন।

এমনিভাবে কথা বলে শশাঙ্ক, জীর্ণ শীর্ণ আধবুড়ো এক কেরানি। এই দুর্ভিক্ষের দিনে তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে বুকটা যেন তার কেঁপে উঠেছে। দায়িত্ব তো ভারী, শুধু দেখা যে বড়ো বড়ো তালাগুলি ঠিকমতো লাগানো আছে আর দারোয়ান ও পাহারাওয়ালা

ক জন ঠিকমতো কাজ করছে। একটা তালা খুলবার ক্ষমতাও তার নেই। তবু তার কথা শুনে মনে হয়, চারিদিকের ওতপাতা মুনাফাখোরদের কবল থেকে সেই বুঝি এই খাদ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে সাধারণ দুঃখী লোকের জন্য জমিয়ে রেখেছে। তবে, শশাঙ্ক কখনও শত্রুতা করে না। হাতের তালুতে ভাঁজকরা কিছু নিয়ে ওর হাতে হাত মেলালে খালি হাত ফিরে আসে, খাতির বাতিল করার বাহাদুরি ওর নেই। তার সরবরাহ আটহাজার মন আটা দেখে সেও মুখ বাঁকিয়েছিল, কিন্তু সময়মতো জায়গামতো ঠিক কথাটি বলতে কসুর করেনি,—আটা মোটা হলে একটু ভোঁতা গন্ধ ছাড়ে হুজুর, নতুন আটাতেও। লোকে এ আটা পেলে লুফে নেবে !

না বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিছু। কেনা মাল যেমন হোক গুদামে তোলাই তখন কাজ। পরের কথা পরে।

শশাঙ্ক নিজেও জানে না বিশেষ দরকার না থাকলেও নিবারণ বা মি. রায়ের পক্ষ টেনে সময় মতো ও সব সমর্থনের কথা কেন সে বলতে যায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা তার উপকার করা বা ক্ষতি করার। সব কিছু ঘটে একরকম তার নাগালের বাইরে, দু-চারটে নোট তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় সে যাতে কোনো গোলমাল না করে, চুপ করে থাকে। মুখটা বন্ধ করে রাখার পুরস্কার ওটা। কেন তবে সে বাহাদুরি করতে যায় ? টাকার কৃতজ্ঞতায় ? অথবা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতে, আমিও আছি এর মধ্যে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি আপনার অনুগত, আপনারই পক্ষে ?

হয়তো ভালোই হয়েছে ফলটা। তাকে যে বিশ্বাস করে ওপর থেকে, তার তো প্রমাণই পাওয়া গেল। কিন্তু উপার্জনটা বড়ো কমে গেছে এই বিশ্বাসের বোঝায়। এই কাজে এসে উপরি তেমন জুটছে না। আগেকার বাটোয়ারার জের টেনে কিংবা নায়েবের সঙ্গে এখনও তার খাতির আছে এই জন্য ভিক্ষার মতো কিছু যদি কেউ দেয়।

বিশেষ কিন্তু আপশোশ হয়নি শশাঙ্কের। মনটা তার চিরদিনই একটু স্পর্শপ্রবণ ছিল, চারিদিকের আকাশছোঁয়া লোভ ও স্বার্থপরতার চাপে কঠিন হয়ে গেলেও এখনও দুঃখের ছোঁয়া লেগে তাকে একটু উন্মনা করে দেয়। অন্তরের এই বিলাসিতাটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সে পুষে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মতো উপভোগ করে। চারিদিকে অনাহারে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চোখে দেখে এবং বর্ণনা শুনে ও পড়ে সে দুঃখিত হতে সাহস পায়নি, নিজেকে উদাসীন করে রেখে দিয়েছে। আনমনা হয়ে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে, এ তো পরের, গরিবদুঃখীর না খেয়ে মরার জন্য সমবেদনা বোধ করা।

এখন আর অতটা মনকে বাঁচিয়ে চলবার দরকার হয় না শশাঙ্কের, খেতে না পেলে ক্রমে ক্রমে নানা বয়সের মানুষের কী অবস্থা হয়, কী অবস্থায় তারা মরে পড়ে থাকে পথের ধারে, এ সব এখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে, দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলতে পারে। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য তার মনে এই জোরের সঞ্চার করছে। এই বিরাট খাদ্যভাণ্ডারের সংস্পর্শে থেকে সে অনুভব করে, আর ভাবনা নেই, না খেয়ে এবার আর মরবে না কেউ এ শহরে বা আশেপাশের গ্রামে। কে পেট ভরে খেল কার আধপেটা জুটল সে হিসেব চুলোয় যাক, না খেয়ে কেউ আর মরবে না এত খাদ্য থাকতে !

টিনের ফুটো আর ফাঁক দিয়ে খাদ্যের গন্ধ প্রতিদিন নাকে এসে লাগে শশাঙ্কের, খাদ্যবস্তুর এই অবিস্মরণীয় ঘনিষ্ঠতায় তার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে যায় : হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই খাদ্য দুর্দিন পার করে দেবে।

স্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে লেভেল-ক্রসিংয়ের রাস্তা দিয়ে শহরে যাবার সময় গুদামটা ডাইনে পড়ে। এ রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়িঘোড়াই চলে বেশি। দুপুরবেলা হঠাৎ জামাই সত্য এসে প্রণাম করায় শশাঙ্ক টের পায়, একটার গাড়ি থেকে নেমে সত্য বাড়িতে যায়নি, লেভেল-ক্রসিং হয়ে সোজা এখানে এসেছে। কারণটা শশাঙ্ক বুঝে উঠতে পারে না। এইখানে যে তার আপিস হয়েছে আজকাল তাও বা জামাই কী করে জানল সে ভেবে পায় না।

বাড়িতে যাওনি ?

আজ্ঞে না। ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাই। এই নাকি ফুড স্টোরেজ ?

এসে দাঁড়িয়েই মুখ বাঁকিয়েছিল সত্য, মুখের ভঙ্গিটা তার আরও গভীর ভাবোদ্যোতক হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক নিজে থেকে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, আটা ময়দা থাকলে ও রকম গন্ধ একটু হয়। চলো তোমাকে নিয়ে বাড়ি যাই।

আপিস ?

আপিস আর কী, বসে থাকা। একদিন একটু তাড়াতাড়ি গেলে কিছু হবে না। ন মাসে ছ মাসেও এখানে কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কুলির মাথা থেকে সত্যের মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়। প্রথম মেয়ের প্রথম জামাই, বিয়েও হয়েছে মোটে বছর দুই, তাকে এ ভাবে নিজে হাজির থেকে আদর অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে শশাঙ্ক খুব খুশি হয়। আগের কাজে থাকলে এ ভাবে হঠাৎ যখন খুশি জামাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, আগের কাজে থাকলে জামাই বাড়ি যাবার পথে তাকে প্রণাম করার জন্য অতটা ঘুরে যেত কিনা সেটা ভাববার কথা বটে।

আপনার ও আটাময়দা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গরিবদুখি খেতে পায় না, তাদের আবার ভালো আর খারাপ।

দু-একমাস পরে আর মানুষের গ্রহণের যোগ্য থাকবে না। ভেতরে গিয়ে কেউ কখনও দ্যাখে না ?

কই, না ? দরকার লাগলে বার করা হবে, কে আবার দেখতে যায় গেট খুলে ভেতরে গিয়ে ? তুমি তো ভাবিয়ে দিলে আমায় !

ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবার কায়দা আয়ত্ত করতে হয়েছে শশাঙ্ককে অনেকদিনের চেষ্টায়, নতুন জামাইকে সঙ্গে রেখে অত ভাবনা ভাবলে চলবে কেন। কিন্তু রাস্তার দু পাশের শত শত চিহ্ন যেন ষড়যন্ত্র করেছে কথাটা তাকে ভুলতে দেবে না। গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গাঁ ছেড়ে পলাতক কঙ্কালগুলি, সূর্যাস্তের সঙ্গে ওদের কতকগুলির জীবন অস্ত যাবে কে জানে। ছায়া না খুঁজে দুপুরের এই খররোদে হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেক কঙ্কাল ধুলায় ধূসর হয়ে, উৎসুক ভয়ার্ত চোখে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চেয়ে ওরা কী কামনা করছে শশাঙ্ক জানে। জামায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ভীরু করুণ উদাস চাউনি দেখে সত্য অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ি পৌঁছেই শশাঙ্কের ছুটি, জামাইকে লুপে নেয় মেয়েরা। নীচে পিছন দিকের ছোটো ঘরখানায় বসে শশাঙ্ক আকাশ-পাতাল ভাবে। গন্ধ ? গুদামের ভেতর থেকে গন্ধ কিছু বেরোচ্ছে বইকী, সে তো রোজই টের পাওয়া যায়। সে কি ভেতরের সমস্ত খাদ্য পচবার গন্ধ ? অথবা অত খাদ্য একসঙ্গে জমা করা থাকলে এখানে ওখানে একটু আধটু পচন ধরে ও রকম গন্ধ ছাড়ে, যার কোনো প্রতিকার নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে যত সাজানো গুছানো কায়দা করা মিথ্যা কথা শশাঙ্ক শুনেছে আর নিজেও বলেছে আজ সেই কথাগুলিই তার মনের মধ্যে ভাঁজ খুলে খুলে নতুন যুক্তি

আর সত্যের রূপ নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। মেঝেতে যে যে বস্তা লেগে থাকে ড্যাম্প লেগে সে বস্তাগুলি খারাপ হয়ে গন্ধ বেরোয়—কিন্তু উপরের বস্তাগুলির কিছুই হয় না। একটা বস্তা কোনো কারণে আগে থেকেই খারাপ হয়ে থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে চারপাশের অন্য বস্তাগুলি নষ্ট করতে থাকে, তাতেও পচা গন্ধ বার হয়, কিন্তু তাই বলে একটু তফাতের বস্তা কেন নষ্ট হবে ! সত্য এ সব বিষয়ে কী জানে যে বাইরে থেকে শুধু গন্ধ শুঁকেই সে বলে দিতে পারবে ভেতরের সব জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! ভাঁড়ারঘরে একটা ইঁদুর পচলেও তো মনে হয় সমস্ত জিনিস বুঝি পচে গলে ভাপসে উঠেছে। সেই ভুলই হয়তো করেছে সত্য ?

মন শান্ত হয় না। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য যদি সত্যসত্যই নষ্ট হতে বসে থাকে, প্রায় অযোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে মানুষের খাবার ? তার নিজের কোনো ক্ষতি নেই, শশাঙ্ক জানে। গুদামের জিনিস কী অবস্থায় আছে দেখবার দায়িত্ব তার নয়। সে শুধু দেখবে তালা ঠিক মতো লাগানো আছে কি না, পাহারা ঠিকমতো চলছে কি না আর লিখিত হুকুম এলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস ডেলিভারি হল কি না। তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তার নয়। দোষ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তবু এই দুর্দিনে তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য নষ্ট হওয়ার কথা ভাবলেও নিজেকে কেমন তার দুর্বল মনে হয়। পুণ্যের বোঝা ফাঁকা দেখলে পাপীর যেমন হয়, তেমনই যেন অসহায় ঠেকে তার নিজেকে।

দুটি ভিক্ষে দাও গো মা।

খিড়কির এই দরজাতে ভিখারিনি এসে জুটেছে, জঙ্গল বাঁশঝাড়ের বাধা না মেনে ? এঁটো-কাটা [illegible]বাব আস্তাকুঁড় বাড়ির পিছনে থাকে বলে বোধ হয়—জঞ্জালও ঘাঁটা চলে, ভিক্ষাও চাওয়া চলে। বাড়ির পিছনে ছিটাল দিয়ে ভিখারিও চলাফেরা করে কম। জানালা দিয়ে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে ভিখারিনির দিকে। জটবাঁধা রুক্ষ চুলের নীচে শ্যাওলা ধরা মেঝের মতো স্যাঁতসেঁতে মুখ, কোলে একটি শিশু। বাচ্চাটিকে দেখে কেমন একটা ক্লেদাক্ত ভয়ের স্পর্শে সর্বাঙ্গে তার শিহরন বয়ে যায়, গা ছমছম করতে থাকে। এতটুকু মানুষের বাচ্চা মাথা উঁচু করে অস্ফুট আওয়াজে কাঁদছে ? একটা অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর। দড়ির মতো পাকানো রুগ্ণ শিশু দেখেছে শশাঙ্ক, কী করে বেঁচে আছে ভেবে দেহ শিরশির করে উঠেছে কিন্তু এ বাচ্চাটার দিকে তাকালে যেন ধাঁধা লেগে যায় চোখে।

ভিখারিনি ক্ষীণস্বরে ডেকে চলে, দুটি চাল কেউ দিয়ে যায় না। জামাইকে নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যতিব্যস্ত।

এই শোন। এদিকে আয়।

ভিখারিনি উবু হয়ে বসেছিল, জানালায় একটু তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট পিষে ফেলে মুখের একটা ভঙ্গি করে। ভেতরটা রিরি করে ওঠে শশাঙ্কের। নির্জন দুপুরে আধবুড়ো ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কেন ডাকে এত বেশি করে ভিখারিনি তা জেনে গেছে, লোল চামড়া বুড়ির চেয়েও ভাঙা শিথিল ও রোগজীর্ণ ওই বয়সকালের দেহটি নিয়ে ।

কচুগাছ সরিয়ে ভিখারিনি জানালার সামনে আসে।

ক মাসের ছেলে ?

বছর পুরবে বাবু।

বছর পুরবে ! খানিকক্ষণ শশাঙ্ক কথা কইতে পারে না। কাছে থেকে বাচ্চাটাকে দেখে ভেতরটা তার পাক দিয়ে উঠতে থাকে।

এ সব বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ভিখারিনির পরিচয় আছে, সে বলতে থাকে, হওয়ার পর বাপ মোলো। আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা ? খেতে না পেয়ে ওমনি হয়ে গেছে।

না খেয়ে হয়েছে ? না, ভিক্ষে বেশি পাবি বলে নিজে করেছিস ?

কার জন্যে ভিক্ষে করা বাবু ? ওরই জন্যে তো। নইলে—ভিখারিনি নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকায়, মরলে বাঁচি, তা মরবে না। আমার পোড়াকপাল তাই বেঁচে রয়েছে, মেরে ফেলতে পারি না তাই !

এক বছর আগেও সে গেরস্ত ঘরের বউ ছিল, স্বামী নিয়ে ঘর করত, আজ তার মুখে হৃদয়ের ছায়াপাত হয় না, শুধু জ্বালার প্রতিচ্ছবি ছাড়া। শশাঙ্ক নিজে উঠে গিয়ে কিছু চাল আর বাটিতে দুধ নিয়ে আসে, দুধের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতে হয়।

জামাইয়ের এদিকে দুধ কুলোবে না, একবাটি দুধ তুমি দাতব্য করছ !

ও বেলা এক সের দুধ বেশি এনে দেব।

খিড়কির দরজা খুলে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক ভিখারিনিকে বলে, আমার সামনে বসে খাওয়া ছেলেকে পেট ভরে।

আমি খেয়ে ফেলব ভাবছ বাবু ? গাছের পাতা ছিঁড়ে চট করে একটা চামচ বানিয়ে সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করে, এই জন্য বেঁচে আছে বাবু, তোমাদের দয়ায়। কেন দয়া কর বাবু, কেন দয়া কর ? মরলে যে আমি রেহাই পাই !

গুদামের পচা খাদ্যের গন্ধ নাকে লাগায় শশাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এখানেও গন্ধ আসচে কোথা থেকে ? ভিখারিনি উঠে দাঁড়াতে গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা মানুষের গন্ধও কি পচা খাদ্যের মতো ? আশ্চর্য কি, খাদ্যই তো প্রাণ মানুষের, খাদ্য থেকেই তো দেহ ! ভিখারিনি চলে যাবার পর তেত্রিশ হাজার মন খাদ্যের রক্ষক বলে নিজের মধ্যে যে অর্থহীন স্বস্তিটা সে গড়ে তুলেছিল তার অস্তিত্বটুকুও যেন আর খুঁজে পায় না। মনে হয় তারই বোকামিতে তারই একটু অবহেলায়, ওই খাদ্যে যতলোকের জীবন রক্ষা হতে পারত ততগুলি লোক মরে পচে উঠতে আরম্ভ করেছে, দায়িত্ব তার। পচা গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেছে চারিদিক, সে কী বলে চুপচাপ বসে রয়েছে শুধু গুদাম পাহারা দিয়ে ?

শশাঙ্ককে জামাকাপড় পরতে দেখে তার স্ত্রী বলে, আবার বেবুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, সায়েবের সঙ্গে একবার দেখা করব।

জামাই বলছিল তোমার সঙ্গে কী দরকারি কথা আছে।

ডাকবো নাকি, না, আমিই যাব ? শশাঙ্ক ভাবে, জামাইরা সত্যি লাটসাহেব !

তুমিই যাও না, জিজ্ঞেস করো কী বলবে।

খেয়ে উঠে ওপরের ঘরে পান চিবুতে চিবুতে সত্য সিগারেট টানছিল, শশাঙ্ককে দেখে সিগারেটটা একটু আড়াল করে অনেক ভূমিকা ও ভণিতার পর সে তার দরকারি কথায় আসে।

জানেন তো চাকরি করি না, আমি এখন সুখনলালের এজেন্ট। ব্যাবসাই করছি বলা চলে একরকম। কমিশন যা পাই কোনোকালে ব্যাবসা করে অত পার্সেন্ট লাভ কেউ করেনি। এখন কথা হল কি, আপনার গুদামের আটা ময়দা তো পচে যাচ্ছে।

কথার যোগাযোগটা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বুকটা শশাঙ্কের ধরাস করে ওঠে।

গুদামটা আমার নয় বাবা ! সে বলে কোনোমতে।

সত্য হাসে, ও একই কথা। সে যাই হোক, এখনও গুদামের মাল বাজারে বেচাকেনা চলবে। আমার হাতে কিছু রদ্দিমাল আছে, সেটা বদলে দিতে হবে আপনাকে। তেল যা লাগে খরচ করব, তাতে আটকাবে না। আপনারও কোনো ভয় নেই, চ্যালেঞ্জ করলে বলবেন গুনে দ্যাখ মেপে দ্যাখ। যে পরিমাণ নেব ঠিক সেই পরিমাণ রিপ্লেস করব।

পাংশু বিবর্ণ মুখে ঢোঁক গিলে শশাঙ্ক বলে, কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।

নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথাই বলে শশাঙ্ক। গুদামের আপিসে সত্যের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা এতক্ষণে তার কাছে পরিষ্কার হয়।

সত্য আশ্চর্য হয়ে বলে, গুদামের চাবি আপনার কাছে নেই ? দরকার হলে গুদাম খোলে কে ?

আমিই খুলি, সায়েব তখন আমাকে চাবি দেয়। অন্য সময় নিজের কাছেই রাখে।

তাই তো ! সত্য বলে চিন্তিত হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মি. নন্দীর কাছে হেঁটে যাওয়ার ধৈর্য শশাঙ্কের থাকে না, সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বসে। তার চিরকুট পেয়ে খাসকামরায় উঠে গিয়ে সেখানে মি. নন্দী তাকে ডেকে পাঠায়।

আটা ময়দা পচে যাচ্ছে ? এই জন্য আপনি এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন ?

অতগুলি ফুড হুজুর। কতলোক খেয়ে বাঁচত।

ট্যাঁড়া দিয়ে বিতরণ করতে চান না কি ?

আজ্ঞে না।

তবে ? মি. নন্দীর মুখে হাসি ফোটে, আপনি তো বড়ো নার্ভাস লোক মশায় ! নষ্ট হয় তো হবে, আমাদের কী করার আছে ! স্টোর করার কথা, আমরা স্টোর করেছি। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতাই বা কই আমাদের ? ইনস্ট্রাকশন না পেলে কিছুই করা চলে না। তাছাড়া—মি. নন্দীর হাসিটা এবার করুণাদ্যোতক মনে হয়, নানা কোয়ালিটির জিনিস পোরা হয়েছে, সব মাল খারাপ হয়ে দাঁড়ালে ধরা যাবে না। ভাববেন না, সব ঠিক আছে।

বাড়ি ফিরে শশাঙ্ক শোনে, জামাই নাকি সে বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যার সময় মি. নন্দীর বাংলোতে শশাঙ্কের ডাক আসে। সেখানে সে দেখতে পায় সত্যকে।

মি. নন্দী বলে, আপনার কথাটা ভাবছিলাম শশাঙ্কবাবু। আটা ময়দা নষ্টই যখন হয়ে যাচ্ছে, কিছু বাজারে গেলেও লোকে খেতে পাবে। ইনি দু হাজার বস্তা খারাপ মাল বদলে নিতে চান। স্টোর থেকে ওঁকে পছন্দসই দু হাজার বস্তা দিয়ে, ওঁর বস্তা সেখানে রেখে দেবেন।

কেউ জিজ্ঞেস করলে—

জিজ্ঞেস করলে বলবেন, কিছু নতুন মাল এল, কিছু পুরানো মাল চালান গেল। রিপোর্ট ঠিক করে নেবখন।

শালাশালিরা বলামাত্র জামাই বাড়িতে সে রাত্রে মস্ত ভোজ দেয়, হইচই চলে অনেক রাত পর্যন্ত। শরীর খারাপের অজুহাতে শশাঙ্ক সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ঘুম কিন্তু তার আসে না সহজে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

সকালে সত্যসত্যই শরীরটা খারাপ লাগে। খেয়ে দেয়ে আপিসে বেরোবে, সদরের সামনে দেখা হয় গতকালের সেই ভিখারিনির সঙ্গে।

এগিয়ে এসে নিস্পন্দ বাচ্চাটিকে সে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

তোমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।

ছেঁড়া

সেকেলে বুড়ো ছেঁড়া মাদুরে বসে ঝিমোয়। একেলে বুড়ো তার সামনে একগাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল।

ইংরেজি পড়বি না, ইংরেজি ? ভালো করে ইংরেজি পড়। বেশি করে পড়। ইংরেজি ভালো জানলে বাস।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও উৎসাহ বেশ আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পড়ন্ত রোদ কাঁপছে খড়ের জীর্ণ চালায় রংটুকু হারিয়ে সিক্ততায় চিকচিকিয়ে কাঁদছে। পচার চোখ চকচক করে উঠছিল ভেজা গাছপালার দিকে চেয়ে, ওই আড়ালের ওপারে খেলার মাঠের কাদা, নদীর ধারের পিছল তীর। শ্রান্তিতে মিইয়ে যায় মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি। সারাদিন স্কুল করে এসে আবার পড়া তৈরি করা, দিনের আলোয় যতক্ষণ পড়া যায়। ভাঙা লণ্ঠন জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। কেরোসিন নেই। কিন্তু খেলাধুলোও যে চলবে না সন্ধ্যার পর, তা কি ভাবে দাদু, মামিমা মানে।

ইংরেজি পড়, ইংরেজি শেখ। ইংরেজি একটু জানলে, বাস, আর ভাবনা নেই। রাখাল দুটো ইংরেজি কথা কইতে শিখেছিল ফাস্টোবুক পড়ে, কলকাতায় দালান রেখে গেছে। বোকাসোকা ছিল, তবু। ভাঙা ভাঙা ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও ঈর্ষার সুর মেলে। বাঁধা বলদটা হাড় পাঁজরায় ধুকছে উঠোনের কোণে কাদা গোবরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে গুতুচ্ছে থেকে থেকে পোকা মাছির জ্বালায়। আগামী চাষের আয়োজনে লাঙল টানার জন্য ওকে পুষতে হবে দিন মাস ধরে, এবারের কাজ ওর সারা। ও বছরের কুমড়ো মাচাটি ফাঁকা, লিকলিকে লাউ চারাটি সবে উঠেছে মাচাতে। অনেক কুমড়ো দিয়ে গেছে গাছটা। ফুল আর ডগাও খাইয়েছে অনেক। কোথায় যে গেল তার চিহ্ন !

পড়তে বলছি না ? চুপচাপ বসে রয়েছিস ?

হাতড়ে কঞ্চিটা খুঁজে নিয়ে সেকেলে বুড়ো সপাৎ করে বসিয়ে দেয় পচার পিঠে, মুখবিহীন গোল যে ফোড়াটা বড়ো হয়ে উঠছে সেটাকে প্রায় ছুঁয়ে।

ফুলু সুখী হয় তার চিৎকার শুনে। বুড়োটা মেরেছে পচাকে, বুড়ো চটেছে পচার ওপর। এই তার অস্থায়ী একটু অবসর ছোঁড়াটাকে দুটো গালমন্দ শাপমন্যি দেবার। বুড়ো চটেছে, কিছু বলবে না। নাতিকে গাল দিতে শুনেও।

চেঁচাল কেনে ষাড়ের মতো ? মরণ হয় না ! ঘরের পক্ষী তাড়াবে চেঁচিয়ে। মরণ নেই ! টেনে নিতে পারে না বাপে মায়ে যেথা গেছে ?

ননদ পো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সংসারে বাপ-মাকে খেয়ে। খাওয়া পড়া দিয়ে রেয়াত নেই, ইস্কুলে পড়ছেন। বই খাতা কাগজ পেন্সিল, মাস গেলে মাইনে, কত কী। বুড়ো দেয় বটে খরচা, কিন্তু কেন পয়সা ঢালবে বুড়ো ওর পেছনে ? ওকে দিতে না হলে তো সংসারে দিত।

দিত কি ? গায়ের জোরেই মনকে বলাতে হয়, দিত, দিত, নিশ্চয় দিত। মনকে এ কথা না বললে জোর থাকে না জ্বালার আশা থাকে না মরণ কামনা ফলবে।

মা, ওমা মা ! খিদে পায় যে, মা ওমা, মাগো ?...

নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে শুনু পিছন থেকে ছেঁড়া পচা কাপড় চেপে ধরে। ওকেও মরতে বলার ঝোঁকে দমক মেরে ঘুরতে যেতেই পাছার কাছে ফেঁসে গেল জ্যালজেলে কাপড়।

খা ! খা ! খা ! মোকে খা ! পাঁজর-ভাঙা মরণ কান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। বুড়ো বেঁচে থাক, পচা সুখে থাক, তার কেন মরণ হয় না ভগবান। দিনে রাতে সাপের ছোবল আর সয় না।

হেথায় কেন গোল কর শুনুর মা। পচা পড়ছে। ইংরেজি পড় পচা। চেঁচিয়ে পড়।

উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ঝমঝমিয়ে। গলগল করে উগলানো ধোঁয়া পিছনে পড়ে থাকছে গুমোটে মরার মতো এলিয়ে। দখিন কোণে দূরের ওই লোহার চোঙা থেকে ধোঁয়া সোজা উপরে উঠছে আকাশের নাগাল পেতে। ওর কাছে স্টেশনটাতে থেমে এসে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

কোঠাবাড়ির মনাবাবুর বউটা কলেরায় মারা গেছে পরশু, ট্রেনে কি মনাবাবু আজ এলো ? এতদিন আসেনি, বউ মরেছে খবর শুনে আসবে নিশ্চয়। ছেলেটা হল দেড় বছরের, গা-ভরা ঘায়ে কী কষ্ট ওইটুকু কচি ছেলের।

শুনুর বাপও যদি আসে এই গাড়িতে ! বউটা তার মরেনি, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে মরে যাওয়া উচিত হলেও, তবু যদি এখনই আসে, হঠাৎ কোনো মনের খেয়ালে আসে চার-ছমাস আসেনি বলে। যদি নিয়ে আসে রেশনের একজোড়া নতুন শাড়ি, রঙিন একটি শায়া, টুকটুকে লাল কি বেগুনি রঙের। আর সস্তা সাদা গোছের ঘি, পাঁপর, চানাচুর লেবেঞ্চুস—

ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। একটা দুটো তিনটে। ছিঁড়ে দিয়ে গেল সব স্বপ্ন, মাড়িয়ে দিয়ে গেল সাধ। বুক দুরু দুরু করে ফুলুর। এখানে উনুনের সামনে বসে সে দেখতে পায় বড়ো প্রকাণ্ড জোড়া চাকা রাস্তায় খাদগুলির জল কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কানাই আর নিধুর দুটো ঘর ডিঙিয়ে জল কাদা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগবে এখানে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে পচা বুড়োকে শুনিয়ে। একটা পাখি শিস দিল এই ঘর-ছোঁয়া আমগাছটার ডালে। আমের সোয়াদ এবারও জিভে লাগল না, এবারও তিনটে গাছই বুড়ো জমা দিয়েছিল রামশরণকে। একটা গাছ রাখ নিজেদের জন্যে, ওই বর্ণচোরার গাছটা, সবুজ-কালো আমগুলিতে যেন মধু পোরা, কী রং আর কী মিষ্টি গন্ধ। তা নয়, সবগুলি গাছ বুড়ো জমা দিয়েছিল। নাতিকে পড়াবে, ইস্কুলে পড়াবে। মরণ হয় না।

কাঠ কুড়িয়ে ফিরল বুঝি পিসি, ভিজে কাঠপাতা আজ আর জ্বলছে না। এখনও বেলা আছে, আর খানিকক্ষণ খুঁজে পেতে আর কটা বেশি শুকনো ডাল, ঝোপটোপ আনা পোষাল না পিসির, দুবেলা খাবার মুখটা আছে।

পদী আবার চেঁচাচ্ছে। অবেলায় কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জ্বরটা বাড়ছে আবার। আর কাঁথা নেই চাপা দেবার। যেমন বুদ্ধি বুড়োর, এত বড়ো মেয়েকে পার না করে ঘরে রেখে পুষছে। শুনুর বাপেরও যেন কোনো চাড় নেই বোনটাকে পার করবার। পইপই করে সে বলেছে শুনুর বাপকে, ফের এ বর্ষায় জ্বরে পড়লে যা ছিরি হবে মেয়ের, পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কেউ আর ছোঁবে না তখন। সেরে উঠে ফের একটু মানষের মতো দেখাতে আরও ছ মাস এক বচ্ছর। তা কে শোনে কার কথা ! মরে যদি যায় তো অবিশ্যি আর—সেই আশায় আছে নাকি বুড়ো আর শুনুর বাপ ? যাকগে বাবা যাক, তার অত ভাবনায় দরকার কী। নিজের জ্বালাই বলে তার সয় না। দিনরাত শত বিছায় কামড়ায় আর ছোবল দেয় সাপে।

মা, ওমা, মা, খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো !...

ওকে ভোলানো গেল না এক কোয়া কাঁঠাল দিয়ে দু দণ্ডের বেশি। ভুতুড়ি তোলা আছে সকালে সিদ্ধ করা হবে বলে, তাই হাতড়ে কোয়াটা মিলেছিল। আর নেই, আর একটি কোয়াও নেই।

এই যে ভাত নামবে যাদু, খাবে। একটু সবুর, সোনা আমার। হল বলে, এই হল বলে।

শুনু ভোলে না, কেঁদে চলে। কথায় কি খিদে ভোলে কেউ।

আমায় খাবি ? মানা খাবি ? খা।

কোলে নিয়ে শুকনো মাই গুঁজে দিতে যায় শুনুর মুখে, সে দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকে। তিন বছর মাই ছেড়েছে দুধ না পেয়ে চার বছরের মানুষ, সে কি আর এ ফাঁকিতে ভোলে।

তখন উনানে চাপানো হাঁড়ি থেকে এক হাতা আধসিদ্ধ জাউ আর পাথরের বাটি থেকে একটু কচু শাক তাকে দেয় ফুলু। ঠান্ডা শাকটুকু সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে শুনু। খাওয়ার মতো জুড়োলেই খায় জাউটা। তারপর আরও চেয়ে কাঁদে ঢিমে সুরে নেতিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানে।

সময় কি পার হয়ে গেছে শুনুর বাপের আসবার, এসেই যদি থাকে ওই গাড়িতে ? এমনি যদি এসে থাকে মিছিমিছি ° এক কোশ পথ, জলে কাদায় চলার মতো নেই। হেঁটে আসতে সময় লাগবে বইকী।

আসে যদি তো তাকে সে খাওয়াবে কী ? পরশু বাড়ন্ত হবে চাল, কিনে না আনলে। এতগুলি মুখ তো বাড়িতে। বিকালে জাউ বরাদ্দ, নয় তো পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারি দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে, ওই চালের ভাত। ভাগ্যে শুনুর বাপের মনিঅর্ডার এসে গিয়েছে ডাকঘর বন্ধ হবার আগে, চাল কেনা যাবে। কটা আর টাকা, কতটুকুই চালই বা কেনা যাবে, যা দর বেড়েছে চালের। চাল বাড়ন্ত হবেই এ মাসে, ও আর ঠেকানো যাবে না, পরশুই হবে না চাল বাড়ন্ত এইটুকু শুধু ভরসা টাকাটা এসে পড়ায়। বুড়ো এগারো টাকা পেনশন পেয়েছে, আগের জমানো দু-দশ টাকা আছেও নিশ্চয় হাতে, কিন্তু বুড়োর ভরসা করা বৃথা ও নিজে খাবে, নাতিকে খাওয়াবে নাতিকে ইংরেজি পড়াবে ইস্কুলে।

শীতকালের জমাট নারকেল তেলের মতো সাদা ঘি আনবে, পাঁপর আনবে লেবেঞ্চুস আনবে শুনুর বাপ, শাড়ি আনবে, শায়া আনবে তার জন্য, এই জাউ আর কচু শাক সে খাওয়াবে নাকি তাকে ? কুলোবে না—এতে তাদেরই আধপেটা হবে না পদীকে বাদ দিয়েও, শুনুর বাপ এলে এতে কুলোবে না। চাট্টি চাল নিয়ে সে আবার ভাত রাঁধবে। দুটি যে ডাল আছে তোলা, তাও দিয়ে দেবে হাঁড়িতে। খিচুড়ি হবে না, ডালেচালে সেদ্ধ একটা জিনিস হবে যা হোক কিছু। ভিন্ন করে ডাল রাঁধতে হলে—

নিবুনিবু উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে ফুলু। কাঠির মতো, সরু কটা শুকনো ডাল আর বাকি আছে, পিসি যা কুড়িয়ে এনেছে সব ভিজে চুপসে, কালও জ্বলবে না। ডাল ভাতে একটা চড়াও সে রাঁধবে তবে কী দিয়ে শুনুর বাপ যদি এসেই পড়ে এখন ?

আসবে না এখন আসতেই পারে না। ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, এখন কি আর সে ছুটি পাবে একটা দিনের, এমনি অবস্থায় দুমাসের মধ্যে পেল না ? ধর্মঘট শুরু না হলে বরং কথা ছিল। এখন কাজ না করলে তো তাড়িয়েই দেবে একেবারে। বুড়ো তাই বলছিল।

কিন্তু যদি ধর্মঘট করে থাকে শুনুর বাপ ?

নিশুতি রাতের ভিজে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দেয় বিদ্বেষী কুকুরগুলির ভীরু আর্তনাদ। শেয়ালের পালা-ডাকের জবাব নয় এটা, শেয়াল ডাকেনি কিছুক্ষণের মধ্যে। কী হল, কে এল পাড়ায়, কে জানে। ফুলুর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পেট ভরে অনেক কিছু খাওয়ার কল্পনার অলীক কষ্ট আর উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখে, চোখ বুজে আর চোখ মেলে সে দেখবার চেষ্টা করে ঘরের আঁধার বেশি কম হল কিনা। তাতেও আনমনা হতে পারে না।

মনাবাবু আসেনি বিকালের গাড়িতে। কানাই ছাড়া কেউ আসেনি। কানাই যে এসেছে তাও ফুলু টের পেয়েছে মাত্র খানিক আগে পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কানাইয়ের রামপ্রসাদি গান শুনে। এমন সুন্দর গাইতে পারে কানাই রামপ্রসাদি গান, মদ খেয়ে অনেক রাতে সে গান ধরলে এমন আকুল হয়ে ওঠে ফুলুর প্রাণটা। মন তুমি কৃষি কাজ জান না গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ কেন যে থেমে গেল কানাই।

কার সাথে যেন কথা বলছে। শুনুর বাপের গলা !

বাবা শুনছেন ? ওঠেন। ছেলে এয়েছে আপনার।

দোর খুলে দাও ?

খুলি।

আঁধার রাতে একা দোর খুলে দিতে ভয় করে শুনুর বাপকেও। সত্যি যদি না হয়, এমন যদি হয় যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলবে অজানার ডাকে, কোথায় চলে যাবে বাইরের রহস্যময় রাত্রির জগতে। পিসিকে ঠেলে তুলে দেয়। শুনুকে কাঁদায়। পচাকে ডাকে জোর গলায়। ঘুমের মোহকে করে নেয় বাস্তব। হুড়কো খুলবার আগে শুধোয়, কে গা ?

আমি গো আমি। বীরেন।

বাইরে মেঘঢাকা চাঁদের আলোয় রাত্রির রং ফিকে, ঘরে গলা শুনে মানুষ চিনতে হয়। ফুলু হাত ধরে বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তক্তপোশে বসায়। মুখ না দেখে, মানুষ না দেখে, কুশল জানাজানি, কথা বলাবলি কেমন অর্থহীন শোনায়, ব্যঙ্গের মতো মনে হয়।

হঠাৎ যে এলি বীরু ? বুড়ো বলে কাঁপা গলায়।

স্ট্রাইক হল যে ? শোনোনি ?

সব্বোনাশ ! বুড়োর গলায় কাঁপুনি নেই, আওয়াজটা দাপড়ানির, তুই করেছিস কি ? অন্য সময় যেমন তেমন, এখন কামাই করলে তাড়িয়ে দেবে যে চাকরি থেকে !

সবাইকে তাড়াবে ?

সবাইকে ? সবাই কখনও ধম্মোঘট করে ? তোর মতো হাবাগোবা দু-চারজন গরম গরম কথা শুনে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব ডাকঘরে কুলুপ আঁটা। কাজ করব কোথা যে কামাই হবে ?

বীরেনের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দেখাবার রেড়ির তেলের দীপটা জ্বালে ফুলু। তেলটুকু ফুরিয়ে যাবে, কাল মুশকিল হবে সাঁঝকে বরণ করা। তা হোক প্রদীপের আলোয় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি আমকাঠের সিন্দুক টিনের তোরঙ্গের ঘর সংসার আর মানুষগুলি রূপ নেয়, সব জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাঙা চোরা জীর্ণ পুরানো দারিদ্র্যের রূপ।

বেড়ার ওপাশে পদী কাতরায়, দাদাগো, জ্বরে মরলাম গো। একবারটি এলে না দাদা, দেখলে না মোকে ?

খুব জ্বর ম্যালোরি ধরেছে। বলেছিলাম না তোমায় ? ফুলু বলে বীরেনকে।

অ্যাঁ ? ও, হ্যাঁ। বীরেন বলে আনমনে। শ্রান্তক্লান্ত নয়, তাকে চিন্তিত দেখায়, গম্ভীর।

পিসি বলে অনুযোগ দিয়ে, গেরন গেল, গঙ্গায় ডুব দেওয়ালি না বাবা আমাকে ?

পচা বলে, সবাই স্ট্রাইক করেছে মামা ? বাঃ কি মজা ! আমাদেরও স্কুলে কাল থেকে স্ট্রাইক।

কীসের স্ট্রাইক ? বীরেন জিগ্যেস করে। বুড়ো উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

মাইনে বাড়িয়েছে না, সে জন্য। আজ দুজনকে তাড়িয়েছে বলে। শিবুদাকে চেন তুমি, আর একজনকে চেন না, তার নাম সতীশ, সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। মাইনে বাড়াবার জন্য মিটিং করেছিল ছেলেদের নিয়ে, সেক্রেটারির নিন্দে করেছিল, তাই তাড়িয়েছে। ওদের না নিলে, মাইনে না কমালে আমরা আর যাচ্ছিনে স্কুলে।

ইস্কুল যাবি না ? টান হয়ে যায় বুড়ো, রাগে থরথর করে কাঁপে। তোর ঘাড় যাবে ইস্কুল। আমি তোকে কাল ইস্কুল নিয়ে যাব। আট গন্ডা মাইনে বেড়েছে তো তোর বাপের কি ? তুই গুনিস মাইনের টাকা ?

মুখচোরা ভীরু ছেলেটাকে সোৎসাহে মামার সঙ্গে এত কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পদী উঠে আসে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেড়ার ওপাশ থেকে। বীরেনের বিয়ের সময় ঘরের মাঝামাঝি মানুষের চেয়ে হাতখানেক উঁচু এই বেড়া উঠেছিল ছেলে বউকে শুতে দেবার জন্য, এ পাশের সব কথা ও পাশে শোনা যায়। শুধু কথা শুনে চলছিল না পদীর।

তিন্যটুকু খেতে দেয়নি দাদা। কাঁদো কাঁদো সুরে পদী নালিশ জানায়।

জ্বরের মধ্যে কি খাবি ? উঠে এলি কেন আবার ? যা, শুয়ে থাকবি যা।

সবাই ভড়কে যায় তার ধমকে। জ্বর গায়ে বোনটা উঠে এসেছে একটু আদরের জন্য তাকে এমন করে ধমকানো ! ওর ন্যাকামিতে ফুলুরও গা জ্বলছিল, কিন্তু এভাবে ধমকে উঠাতে তারও মন সায় দেয় না। আনমনা গম্ভীর শুধু নয়, শুনুর বাপ যেন কেমন শক্ত আর নিষ্ঠুরও হয়ে গেছে।

খারাপ লাগে সকলের, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধমক যে খায় সে খানিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে কথা কয় স্বাভাবিক ভাবে, অভিমানের লেশটুকুর হদিস মেলে না।

একটু উঠলে কি হয়, শুয়েই তো আছি। হাঁ দাদা, গুলিটুলি চলছে নাকি ?

এখনও চলেনি।

কিছু খাবে নাকি তুমি ? ফুলু জিজ্ঞেস করে ভয়ে ভয়ে। কিছুই নেই খেতে দেবার। শুনুর বাপ সত্যই বাড়ি এসেছে এ আনন্দে এতক্ষণ বারবার ঝাপটা এসে লাগছিল এই লজ্জা ও দুঃখের যে, বাড়ির মানুষটা বাড়ি ফিরেছে এতকাল পরে তাকে খেতে দেবার কিছুই নেই গেরস্ত বাড়িতে।

বীরেন বলে যে এত রাতে কিছু আর খাবে না, গাড়িতে খেয়েছে। মনে শান্তি আসে না ফুলুর। সামনে যদি ধরে দিতে পারত কিছু, তারপর শুনুর বাপ বলত খাবে না, তা'হলে ছিল ভিন্ন কথা।

স্থান অদল বদল করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। বেড়ার এক পাশে যায় সকলে, অন্য পাশে ফুলু বীরেন আর শুনু। গাদাগাদি করে শুতে হয় সকলকে, কিন্তু উপায় কী, এতকাল পরে ছেলে বাড়ি এসেছে, ছেলে বউকে নিরিবিলি শুতে না দিলে চলবে কেন। নিবু নিবু দীপটা ফুলু হাতের বাতাসে নিবিয়ে দেয়। এবার কথা বলতে হবে চুপিচুপি, প্রায় কানে কানে, নয়তো ওপাশে শুনতে পাবে ওরা।

বুক কাঁপছে শুনে থেকে। কেন করতে গেলে ধম্মোঘট ?

হুঁ।

এখনও আনমনা অনিচ্ছুক মানুষটা, মোটে চাড় নেই, সাড় নেই। এমন তো করে না কোনোবার বাড়ি এসে। আহত অভিমানে নিজেও চুপ করেই থাকবে কিনা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ফুলু ভাবে। কিন্তু তা কি পারা যায়। টিপি টিপি শুরু হয়ে জোরে বৃষ্টি নেমে ঝমাঝম আওয়াজ তোলে টিনের চালে। এমনি বৃষ্টি খানিকক্ষণ চললেই শোয়ার দফা শেষ। ভাঙা চালার তিন জায়গা থেকে জল পড়বে ঘরের মধ্যে, উঠে সামলাতে হবে। তবে বৃষ্টির শব্দ ওঠায় একটু জোরেই এখন কথা বলা চলবে, শোনা যাবে না।

কী হয়েছে তোমার ?

কী হয়েছে ? হয়নি কিছু। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভালো লাগছে না এখন।

কাজ থাকবে না ? তাড়িয়ে দেবে ? উৎকণ্ঠায় ফুলু ব্যাকুল, তবে যে বললে তালা বন্ধ ডাকঘরে, কিছু হবে না কাজে না গেলে ?

সে কথা নয়। ভাবছি কি, চলে এলাম, কী হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পাব না। বীরেনের কথা উৎকণ্ঠায় ভরা, তা ছাড়া, চলে এলাম, পিকেটিংয়ের লোক যদি কম পড়ে ? যদি হেরে যাই আমরা ?

বললে না হাজার হাজার লোক ধম্মোঘট করেছে ? ওরা তো আছে।

তা আছে। কিন্তু—

কী বলবে ঠিক করতে পারছে না শুনুর বাপ। মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাকে, এটা সে বুঝেছে যে হঠাৎ বাড়ি চলে এসে এখন ভারী উতলা হয়ে পড়েছে তার মন। এত বড়ো একটা কাণ্ড করে এসেছে চাকরির ব্যাপার, এ বাঁচন মরণের কথা। সেখানে কী হচ্ছে জানতে পাবে না ভেবে ব্যাকুল তো হবেই মনটা। কিন্তু ও নেই বলে কিছু হবে না, ধম্মোঘট ভেস্তে যাবে, এ কোন দেশি কথা। এ দুশ্চিন্তার মাথামুণ্ডু মাথায় ঢোকে না ফুলুর। ওই কি কম্মকত্তা ছিল, ধম্মোঘট চালাচ্ছিল ? বীরেনের বুকে মাথা রেখে সে তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। বোঝাবার চেষ্টায় বীরেন বলে, কি জান, লড়াই চলছে তো একটা, একজন কম হলে জোর তো একটু কমল ? তা ছাড়া, আমি চলে এলাম, আর দশজন আমার মতো ভাবল, একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। বুঝলে না ? ভালো লাগছে না আমার।

ভেবে আর কী করবে ?

না, আমার বিশ্রী লাগছে। মিটিং হবে আমি নেই, পিকেটিং হবে আমি নেই,—

অবিরল জল ঝরে টিনের চালে, বিরাট জনতার গর্জনের মতো আওয়াজ চলে অবিরাম। কারও চোখে ঘুম নেই। বীরেন ছটফট করে জ্বরের রোগীর মতো। ফুলুকে উঠে প্রদীপটা আবার জ্বালতে হয়, ঘরে জল পড়ছে। মেঝে ভেসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে আর শোয়া চলবে না, কিছু রাখাও চলবে না। সেকেলে পুরানো তক্তপোশটি আর ও বছরের বানানো বাঁশের ছোটো নিচু মাচাটিই এখন সম্বল সকলের। পদীকে মাচাটিতে শুতে দেওয়া হয়। কাঁথাকানি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় তক্তপোশে।

ফুলু বসে মেঝেতে একটা পিড়ি পেতে। প্রদীপ নিভে গেছে তেল ফুরিয়ে।

ভোরের আগে বীরেন বলে, আমি রওনা দি। ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে।

বিষ্টি পড়ছে যে ?

পড়ুক বিষ্টি। ভিজে ভিজেই যাব।

কাগজ মোড়া শুকনো জামা কাপড়ের পুঁটুলিটা বগল দাবা করে ভিজতে ভিজতে বীরেন স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছে অর্ধেক পথ, পিছন থেকে ডাক আসে, মামা !

বীরেন দাঁড়ায়। পচা এসে তার নাগাল ধরে। কেঁদে বলে, আমি কাল ইস্কুল যাব না মামা।

এই কথা বলতে এলি ভিজে ভিজে অ্যাদ্দুর ?

দাদু জোর করে নিয়ে যাবে ইস্কুলে। এখানে থাকব না আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বীরেন হাঁটতে শুরু করে বলে, হাঁট তবে, জোরসে হাঁট। গাড়ি ফেল করলে চড় খাবি।

ওপরে বৃষ্টিপাত, নীচে খাল খন্দ কাদা ভরা পিছল পথ। দু জনে এগিয়ে চলে পাশাপাশি। বীরেন হাত ধরে পচার।

পরিস্থিতি-অন্তর্গত পেট ব্যথা গল্পের মাসিক বসুমতী পত্রিকাভুক্ত প্রথম প্রকাশের শিরোনামচিত্র